আমাদের শান্তিনিকেতন

আমাদের শান্তিনিকেতন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

উৎসর্গ

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বালক ও কিশোর বয়সে যে-সকল শিক্ষকের পদপ্রান্তে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, যাঁরা তাঁদের জীবনের দ্বারা আমাদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেছেন এবং তাঁদের স্নেহের দ্বারা আমাদের কল্যাণসাধন করেছেন, যাঁরা জীবিকার অনুরোধে কিছু বেতন নিলেও তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করে গিয়েছেন, যাঁরা নিভৃতে সাধনা করে বিদ্যার্জন করে সেই লব্ধ বিদ্যার বিতরণে কার্পণ্য করেন নি এতটুকুও, যে-সকল শিক্ষকেরা সত্যিকারের গুরু ছিলেন, তাঁদেরই বিশিষ্ট একজন, যিনি উত্তরকালে বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদ অলংকৃত করেছেন, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে আজও বর্তমান রয়েছেন সেই

পরমপূজনীয় পণ্ডিত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

মহাশয়ের শ্রীচরণে

আমার এই শান্তিনিকেতন-স্মৃতি পরম শ্রদ্ধাভরে এবং ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উৎসর্গ করলাম।

১ আষাঢ় ১৩৬৬ | প্রণত
স্বপনপুরী। কালিম্পং | শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

চিত্রসূচী

অধ্যায়শীর্ষে মুদ্রিত চিত্রাবলী শ্রীবিশ্বরূপ বসু কর্তৃক অঙ্কিত।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রখানি বসুবিজ্ঞানমন্দিরে রক্ষিত। জগদানন্দ রায় মহাশয়ের চিত্রখানি শান্তিনিকেতন-কলাভবনের চিত্রসংগ্রহে আছে। শমীন্দ্রনাথের চিত্র রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহভুক্ত। নিচু বাংলা এবং দিনেন্দ্রনাথ চিত্রদ্বয়ের ব্লক প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নিবেদন

শান্তিনিকেতনের আদি যুগের কথা বহু লোক বহু বার বলেছেন এবং আমিও বলেছি। সে-সব কথা আজকে আবার বললে খানিকটা পুনরুক্তি হবেই। কিন্তু শান্তিনিকেতনে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ -এর অতি সামান্য পরিচয় অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে পেয়েও বাল্যজীবনে যে আনন্দসুখ অনুভব করেছিলাম তার কথা বলে তো শেষ করা যায় না। অতীতের সে-সব কথা বলবার লোকসংখ্যাও কমে আসছে। এইজন্যে কয়েকটি স্নেহভাজন তরুণ বন্ধুর অনুরোধে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিগত দিনের সরল সুন্দর ও সরস জীবনযাত্রার যে চিত্রটি আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তারই একটি প্রতিচ্ছবি নিতান্ত অপটু তুলিকায় আঁকবার প্রয়াস পেয়েছি এই রচনায়। গুরুদেবের মহান আদর্শের আওতায় এবং আশ্রমদেবতার অনুকম্পায় যে মাধুরী এ জীবনে আমি পেয়েছি এবং পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছি, শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রী ও কর্মী, যাঁরা বর্তমানে আশ্রমে রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আশ্রমে আসবেন, তাঁরা সকলেই সে মাধুরী জীবনে অনুভব করে ধন্য হবেন, সর্বান্তঃকরণে এই কামনাই করি।

স্মৃতিকথা লেখার বিপদ এই যে, সময়ের দূরত্ব -হেতু ঘটনাপরম্পরায় স্থানকালভেদ বহুল পরিমাণে অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে ঘটনাগুলি অনেকসময় একেবারে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ায়। এমনও হয় যে পরের ঘটনাগুলি আগেই মনে এসে যায় এবং আগের ঘটনাগুলি পিছিয়ে পড়ে। সুতরাং এই রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে ঘটনা-সমাবেশে দিন-ক্ষণ-তারিখের বৈষম্য পরিলক্ষিত হতেও পারে। পাঠকদের এইটুকু অনুরোধ করি, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে এই রচনায় একটি ছবি আঁকবারই চেষ্টা করেছি— ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টা এতে নেই।

অনেক বাল্যবন্ধু এবং কোনো কোনো মাস্টারমহাশয়ের কথা এতে হয়তো-বা উল্লেখ করা হয় নি। তার কারণ এই নয় যে তাঁরা স্মরণীয় কি প্রণম্য নন ; স্মৃতিশক্তির ক্ষয় এবং ক্ষীণতাই এই ভুলের যথার্থ কারণ। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি মার্জনীয় হবে বলে আশা করি।

এই স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপি-সংশোধন ও সৌষ্ঠবসাধনের ভার নিয়ে স্নেহ-ভাজন শ্রীপুলিনবিহারী সেন, তাঁর সহকর্মী শ্রীকানাই সামন্ত আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর অন্যান্য কর্মীদের কথাও উল্লেখ করি, যাঁদের সানন্দ পরিশ্রম ব্যতীত অতি অল্প সময়ে এই লেখা আত্মপ্রকাশ করত না।

আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র যে-সকল শান্তিনিকেতনের শিল্পীর চিত্রে এই গ্রন্থ অলংকৃত হয়েছে এবং যে-সকল প্রতিষ্ঠান এই বইয়ের জন্য ছবি ব্যবহার করতে দিয়েছেন তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

রবীন্দ্রনাথ

প্রথম অধ্যায়
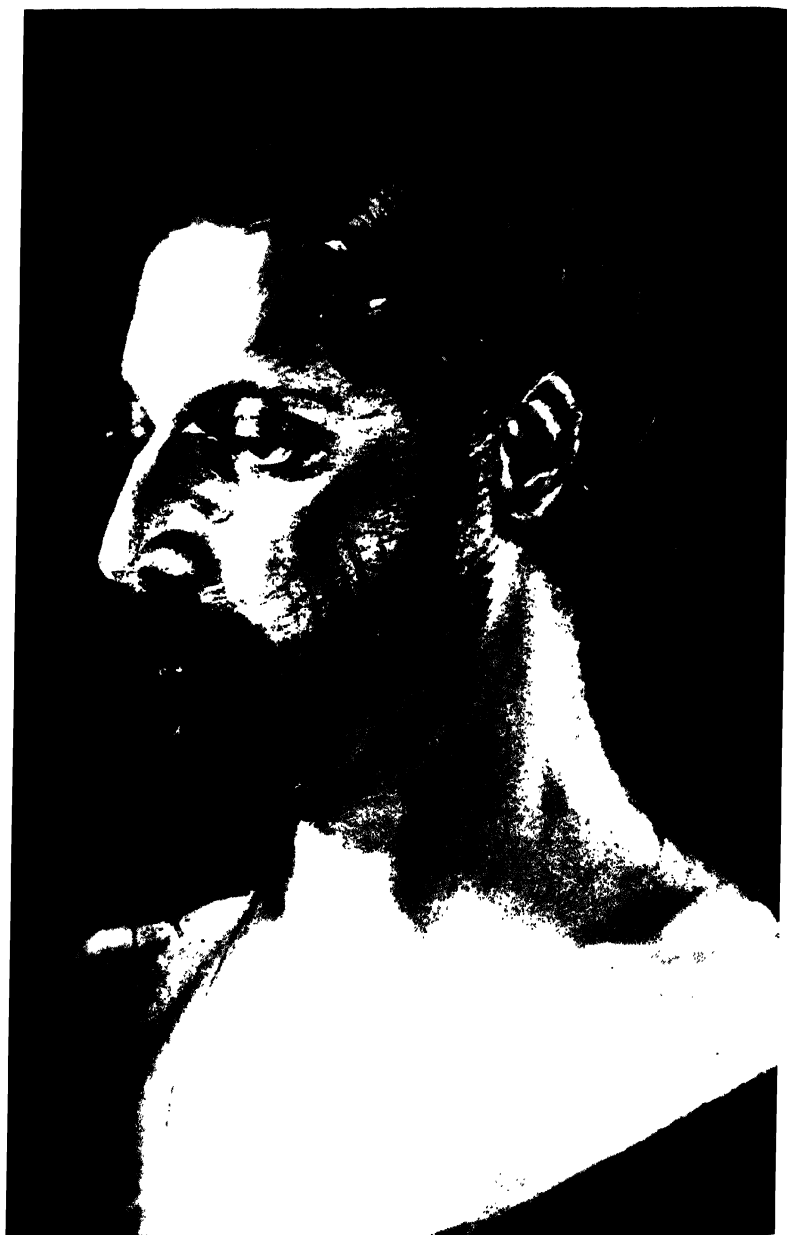
আঠারো শ সাতান্ন সালের সিপাহীযুদ্ধের পরে বেশ কয়েক বছর নির্জীব হয়ে থাকার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই ব্রিটিশ রাজত্বের উপর ভারতবাসীদের অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ আবার মাথা তুলতে আরম্ভ করেছিল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সুবিখ্যাত ঘোষণা দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকর্তারা ভারতীয়-দের যে স্তোকবাক্য শুনিয়েছিলেন তার উপরে বহুসংখ্যক দেশবাসীর আস্থা একেবারেই চলে গিয়েছিল। তরুণের দল ক্রমশই বুঝছিলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে কাগজে কলমে প্রস্তাব পাস করে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। তাঁদের মনে এতটুকুও সংশয় রইল না যে উদ্ধত রাজ-পুরুষদের হাত থেকে ভিক্ষা চেয়ে স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা নিতান্তই নিষ্ফল— স্বাবলম্বী হয়ে নিজের জোরে স্বাধীনতা কেড়ে ছিনিয়ে নিতে হবে। এই ভাবে প্রবুদ্ধ হয়ে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বহু লোক জীবন পণ করে দেশ উদ্ধারের কাজে লেগে গিয়েছিলেন। কত জায়গায় কত গুপ্ত সমিতির গঠন হতে লাগল। পুণাতে ঠাকুরসাহেবের নেতৃত্বে আঠারো শ সাতানব্বই সালের কিছু আগে যে গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাতে অরবিন্দ ঘোষ যোগ দিয়েছিলেন (১৯০২-৩)। তার পূর্বেই তিনি বাংলা দেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কাজ শুরু করেছিলেন, অন্য কয়েকটি গুপ্ত সমিতিও ছিল। বহু দেশভক্ত বাঙালী যুবক সেই-সব সমিতি-ভুক্ত হলেন জীবন-মরণ পণ করে। ভিতরে ভিতরে যখন এই বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, তখন অন্য একদল লোক অনুভব করলেন যে দেশকে রক্ষা করতে হলে এবং সত্যিকারের প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার। সবচেয়ে আগে প্রয়োজন দেশবাসীদের সুশিক্ষা দেওয়া। তার পর কর্তব্য নিজেদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা এবং দেশবাসীর জীবিকার্জনের পথ খুলে দেওয়া। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও উৎকর্ষের দিকে দেশবাসীর মন আকৃষ্ট করতে হবে। অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে স্বাদেশিকতা ফুটিয়ে তুলতে হবে। এঁরা রাজা রামমোহন রায় -প্রবর্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব চন্দ্র সেন -অবলম্বিত পন্থা অনুসরণে মনোনিয়োগ করলেন। জোড়াসাঁকোর

ঠাকুরবাড়ি হল এঁদের মিলনস্থল। হিন্দুমেলা খোলা হল এবং আরো কত কী সভাসমিতির প্রকাশ্য বৈঠক চলতে লাগল। দেশের গণ্যমান্য শিক্ষিত লোকদের বহুজনার সমাগম হত এই-সব অনুষ্ঠানে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে পাই, কলকাতার কলকোলাহলের বাইরে বোলপুর রেল স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুই রাঙামাটির পথ পেরিয়ে ভুবনডাঙার ছোটো গ্রামটি ছাড়িয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে, 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন উনিশ শ এক সালের ডিসেম্বরে (পৌষ ১৩০৮)। শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত আকাশ, অবারিত আলো-হাওয়া, দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতের শ্যামল শোভা এবং নিত্যপরিবর্তনশীল ঋতুসকলের নব নব বৈচিত্র্য শিশুমনের উপর প্রতিফলিত হয়ে উঠে তাদের কোমল হৃদয়গুলিকে প্রস্তুত করবে সার্থক বিদ্যা গ্রহণের উদ্দেশে এবং সেই-সব শিশুদের অন্তরক্ষেত্রকে অভিসিঞ্চিত করে দেবে মহর্ষিদেবের ধ্যান দিয়ে গড়া ধর্মজীবনের অনাবিল মন্দাকিনীধারায়, আত্ম-নিবেদনপর ভক্তজীবনের মহান আদর্শের প্রভাবে বেড়ে উঠে শিশুরা জীবনে মাধুর্য ও চরিত্রে বল লাভ করবে— এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

ইংরেজ শাসনকর্তাদের মনে কিন্তু খটকা লাগল। কলকাতায় এত জায়গা থাকতে ঠাকুরবাড়ির স্বদেশীদলের অন্যতম নেতা হঠাৎ কেন বোলপুরের নির্জন মাঠের মধ্যে গিয়ে স্কুল খুলে বসলেন ? ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামের অন্তরালে ইনি স্বদেশী দল তৈরি করছেন নাকি ? তাঁদের চোখে ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক মনে হল। তার পর যখন উনিশ শ পাঁচ সালে লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গ হল এবং দেখতে দেখতে ধোঁওয়া থেকে দেশে আগুনও জ্বলে উঠল তখন সরকারের সেই সন্দেহদৃষ্টি স্বভাবতই রোষরক্তিম হয়ে উঠল। এর ফল এই হল যে, কোনো সরকারী কর্মচারী, কিংবা অন্য কোনো লোক যিনি সরকারের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন, তাঁরা তাঁদের সন্তানদের এই বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইতেন না কিংবা চাইলেও ভয়ে পাঠাতেন না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিয়ম করেছিলেন যে, দশ বছরের বেশি বয়সের ছেলেদের তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে না, কেননা বেশি বয়সের ছেলেদের মন গঠিত হয়ে যায়, তাতে তখন অন্য কোনো ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় না। এই দুই কারণে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তখন ছাত্রসংখ্যা নিতান্তই কম ছিল।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁরই কাছে কবিতায় চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

বন্ধু হে,
পরিপূর্ণ বরষায়
আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম করো সায়—
এসো চট্‌পট্‌।
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা প'ড়ে মোর চিত্ত
করে ছট্‌ফট্‌।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং এই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোষচন্দ্র—এঁদের দুজনকে নিয়েই সূচনা হয়েছিল আশ্রম-বিদ্যালয়ের। এঁরা দুজনেই একসঙ্গে পরে আমেরিকা গিয়ে ইলিনয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা অর্জন করে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে শান্তিনিকেতনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সন্তোষদা পরে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের ভার নিয়েছিলেন এবং তা বহন করেছিলেন তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত। রথীদা শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর কর্মসচিব হয়ে বহু বৎসর আশ্রমের পূর্ণ দায়িত্ব বহন করেন এবং বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় ব'লে আইন দ্বারা ঘোষিত হলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পদে বৃত হয়েছিলেন।

পরে পরে শান্তিনিকেতনে বিদ্যার্থী-সমাগম হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের দৌহিত্র এবং স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ও অ্যাটর্নি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র নয়নমোহন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কিছুকাল অধ্যয়ন করেছিলেন। ইনি পরে ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল ব্যবহারজীবীর কাজ করে অল্পবয়সেই মারা যান। সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার ও সমাজসংস্কারক আনন্দমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দও শান্তিনিকেতনের আদি যুগের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে জর্মনিতেও শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং সেই

থেকে বিদেশেই রয়ে গেছেন। সম্প্রতি তিনি গুরুদেবের কবিতার ইংরেজি অনুবাদের কাজে বিশেষভাবে ব্রতী আছেন। আসামের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অপূর্বকুমার চন্দও এক সময়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন। তিনি পরে অক্সফোর্ডের ডিগ্রি নিয়ে ভারত-সরকারের শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং কালক্রমে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এবং পরে বাংলা সরকারের শিক্ষাধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। স্বনামখ্যাত জে. এন. রায়ের এক ভাইপো হিমাংশু রায় এবং এক ভাগিনেয় প্রমোদ রায় বোধ হয় এই সময়েই এসেছিলেন। হিমাংশুর ডাকনাম ছিল শুনেছি গোলাপ। তিনি পরে বোম্বাই শহরে 'বম্বে টকিজ' প্রতিষ্ঠা করে যশস্বী হয়েছিলেন। প্রমোদদাও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নাম করেছিলেন। আর কারা এই সময়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তা সঠিক স্মরণ নেই।

আমাদের পরিবারে ও ঠাকুর-পরিবারে আলাপ-পরিচয় ও আসা-যাওয়ার সম্পর্ক ছিল। আমার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ব্যবহারজীবী হলেও সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সময়ে তাঁর কিছু হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। দেশবন্ধুর দ্বিতীয়া ভগিনী ছিলেন অমলা যাঁকে আমরা বড়দিদি বলে ডাকতাম। তিনি খুব উঁচু দরের গায়িকা ছিলেন, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। বড়দিদি প্রথমে আমার পিতাকে বলেন যে আমাকে শান্তিনিকেতনে 'রবিকাকার ইস্কুলে' পাঠালে আমার দেহ মন দুয়েরই উপকার হবে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি বাবা আস্থাবান ছিলেন, কিন্তু প্রথমে ইতস্ততঃ করছিলেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়ম মেনে চলে আমার স্বাস্থ্য টিঁকবে কি না এই ভয়ে। দেশবন্ধুর সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী আজীবন আমাকে স্নেহ করে আসছেন। যখন বড়দিদির প্রস্তাবে আমার বৌঠানও সম্মতি দিলেন তখন বাবার আর কোনো আপত্তি রইল না। বড়দিদির কোনো কাজে গাফিলতি দেখি নি, যেটা ধরেছেন সেটা সম্পন্ন না করে নিশ্চিন্ত হন নি। সুতরাং অচিরেই চিঠি গেল 'রবিকাকা'র কাছে আমাকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করার জন্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। সত্বরই রবীন্দ্রনাথের জবাব এল সন্তোষ জানিয়ে। কেননা শান্তিনিকেতনের সেকালে একটা জ্যান্ত ছেলে পাওয়া পরম পরিতোষেরই বিষয় ছিল। সেইসঙ্গে এল

এক কপি ছাপা নিয়মাবলী— নিরামিষ আহার, খালি পায়ে বিহার ইত্যাদি ইত্যাদি। নিয়মাবলীর একটা কথা খুবই মনে লেগেছিল। সেটা হচ্ছে আমাকে কী কী জামাকাপড় ইত্যাদি নিয়ে যেতে হবে। যতদূর মনে আছে তালিকাটা ছিল এই ধরনের— কাপড় পাঁচখানা, সুতোর গেঞ্জি তিনটি, গরম গেঞ্জি একটি, পাঞ্জাবি কি শার্ট তিনটি, গামছা দুখানা, শতরঞ্জি একটি, তোষক একটি, মশারি একটি, মাথার বালিশ একটি, বিছানার চাদর এবং বালিশের ওয়াড় দুটি করে, লেপ কি কম্বল একটি এবং একটি পট্টবস্ত্রের জোড়। বাসনের মধ্যে— গাড়ু একটি, থালা বাটি ও গেলাস একটি করে, আর চাই কাপড় জামা রাখবার জন্যে একটা ছোটো টিনের বাক্স। এ ছাড়া একটি কাঠের বাক্সে ছুতোরের হাতিয়ার, যথা— করাত, হাতুড়ি, বাটালি, র‍্যাঁদা, ও তুরপুণ। এই শেষ জিনিসগুলিই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল— ভাবলাম কী মজাই না হবে। অচিরে সব জিনিসপত্র কেনা হল এবং ঠিক হল দেশবন্ধুর ছোটো ভাই বসন্তকুমার, যাঁকে আমরা 'ভোলাদাদা' বলতাম, তিনি আমাকে সঙ্গে করে রবীন্দ্রনাথের কাছে জিম্মা করে দিয়ে আসবেন বড়োদিনের ঠিক পরে। দিন আর কাটে না। আমি যখন আমার হাতিয়ারের বাক্সটা খুলে জিনিসগুলিতে হাত বুলিয়ে খুশি হতাম তখন আমার সোনাদাদা (এক পিসতুত ভাই) প্রায়ই আমাকে ভয় দেখাতেন; বলতেন, 'যাও-না, দেখবে কেমন মজা! কলকাতার কটন ইস্কুলের নাম শুনেছ তো? সেখানে মেরে ছেলেদের তুলোধুনো করে দেয়। সেখানেও তোমার সানাবে না বলে তোমাকে রবি ঠাকুরের ইস্কুলে পাঠানো হচ্ছে— রবি ঠাকুর ঠেঙিয়ে তোমাকে সোজা বানিয়ে দেবেন। যাও-না, দেখেই এসো-না' ইত্যাদি। শান্তশিষ্ট ছেলে বলে আমার খ্যাতি কোনো দিনই ছিল না; বরঞ্চ বেপরোয়া দুর্দান্ত ছেলে বলেই অনেকে আমাকে অভিহিত করতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সোনাদাদার ভয়াবহ কথাগুলিতে মনটা যে একটুও দমে যায় নি তা বলতে পারি নে।

অবশেষে যাবার দিন এল। বাবা-মাকে প্রণাম করলাম। মা শিরে আঘ্রাণ করে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ভোলাদাদার সঙ্গে রওনা হয়ে হাওড়া স্টেশনে সকালের ডাকগাড়িতে উঠে পড়লাম। এর আগেও দু-একবার গিয়েছি রেলগাড়িতে, এমন-কি স্টীমারে চড়েও; কিন্তু মা তখন ছিলেন সঙ্গে, আর গিয়েছিলাম নিজেদের গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু

এবার তো মা সঙ্গে যাচ্ছেন না এবং চলেছি কোন্ অজানা জায়গায়। ভোলাদাদাও তো আমাকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে যাবেন কলকাতায়, সঙ্গে তখন তো কেউই চেনা থাকবে না। আর সোনাদাদা যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয়? কী হবে? এই-সব বিভীষিকার কথা যখন মনের মধ্যে তোলপাড় করছে ঠিক সেই সময়েই হুইসিল দিয়ে রেলগাড়ি চলতে শুরু করল। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। প্রথম-প্রথম স্টেশনগুলি আসতে লাগল ঘন ঘন— লিলুয়া, বালি, বেলুড়, উত্তরপাড়া— নাম পড়তে না পড়তেই স্টেশন ছাড়িয়ে চলল রেলগাড়ি কত অজানা গ্রাম পিছনে ফেলে, আম কাঁঠাল ও কলা গাছের আড়াল দিয়ে, কত ঘাট-বাঁধানো পুকুর এবং আরো কত পানায়-ঢাকা ডোবার পাশ দিয়ে। ক্রমশ রেল লাইন এসে পড়ল ফাঁকা মাঠের মধ্যে। গাড়ির গতিবেগও বেড়ে চলল। কত স্টেশনের নামই পড়তে পারলাম না। এখন দুই ধারে প্রায়ই আসছে ভাঁড়বাঁধা খেজুর গাছ এবং বুনো কী সব গাছ— মাঝে মাঝে দু-একটা তাল গাছ। টেলিগ্রাফ পোস্টগুলিতে যে মাইলের সংখ্যা লেখা আছে তা-ই গুনতে লেগে গেলাম। গাড়ি এসে দাঁড়াল ব্যাণ্ডেল বলে একটা স্টেশনে। মিনিট কয়েক পরেই আবার গাড়ি ছাড়ল। কত যে মাইল-পোস্ট গুনলাম তার ইয়ত্তাই নেই। গাড়িরও চলার বিরাম নেই। লাইনের দুই পাশের গাছগুলি যেন উলটো দিকে ছুটে চলেছে আমাদের পিছন-পানে। ও দিকে দূরে মাঠের শেষে যে-সব গাছ দেখা যাচ্ছিল তারা যেন আমাদের রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে রেস্ খেলা জুড়ে দিয়েছে। মনটা যেন কেমন অবশ বোধ হল, চোখের পাতা বুজে এল— কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পাই নি। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লাগতেই চোখ খুলে দেখি, বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছে গেছি। কত রকমের লোক গিজ্‌গিজ্ করছে— কত হাঁকডাক কত ফিরিওয়ালার। ভোলাদাদা একটা উর্দিপরা লোককে কী বললেন। সে একটু পরেই কিছু খাবার দিয়ে গেল। জলযোগ সেরে একটু ধাতস্থ বোধ করলাম। আবার ছুটল রেলগাড়ি। তালিত স্টেশন পেরিয়ে খানা জংশনে একটু দাঁড়িয়ে রেলগাড়ি ডাইনে মোড় নিয়ে লুপ লাইনে ঢুকে পড়ল। তার পর দু-এক মিনিট করে বনপাস, গুসকরা আর ভেদিয়ায় থামতে থামতে গাড়ি এসে দাঁড়াল বোলপুর স্টেশনে। ভোলাদাদা আগেই বলেছিলেন যে গাড়ি

আম্রকুঞ্জ

গ্রীষ্মাবকাশ : শান্তিনিকেতন

খুব কম সময়েরই জন্যে বোলপুরে দাঁড়ায়। তাই ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে পড়লাম। একজন কুলি আমার ছোটো বাক্স আর শতরঞ্চি-মোড়া বিছানাটি নামাতে না নামাতেই রেলগাড়ি ছেড়ে গেল। আমরাও কোনোমতে নেমে পড়লাম। ভোলাদাদা এদিক ওদিক চাইছিলেন— বুঝলাম কাউকে খুঁজছেন। এমন সময় শুনলাম কে একজন 'ভোলা', 'ভোলা' বলে হাঁক দিচ্ছে। আমরা ভোলাদাদাকে ডরাই, আর কে এই লোকটা যে 'ভোলা', 'ভোলা' বলে ডাকছে? লোকটার সাহস তো কম নয়! এইরকম ভাবছি এমন সময় দেখি কৃষ্ণকায় বেঁটেখাটো কিন্তু ভীষণ জোয়ালো চেহারার একটি লোক আবার 'ভোলা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ভোলাদাদা তাকে ইশারা করতেই সে এসে থামল এবং একগাল হেসে বলল, 'কলকাতা থেকে যে ভোলাবাবু আসছেন তাঁকে নেবার জন্যেই বাবুমশায় আমাকে পাঠিয়েছেন।' ভোলাদাদা যখন বললেন তিনিই ভোলা এবং কলকাতা থেকেই আসছেন, তখন সেই লোকটি তাঁর দিকে বেশ একবার চেয়ে বললে, 'আজ্ঞে, আসুন তবে।' কুলির মাথায় মাল তুলে ভোলাদাদার হাত ধরে সেই লোকটির অনুসরণ করলাম। টিকিট-বাবুর কাছে টিকিট দিয়ে আমরা স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পরে জানলাম সেই লোকটির নাম কোদো।

তখনকার দিনে বোলপুর রেল স্টেশনটি ছিল নেহাত ছোটো। একহারা কয়েকখানা কামরাওয়ালা ছোটো একতলা পাকা বাড়ি— তার সামনে খিলেন-করা লম্বা বারান্দার পরেই আপ গাড়ির প্ল্যাটফর্ম। কাঠের ওভারব্রিজ দিয়ে লাইন পেরিয়ে নামলেই ডাউন গাড়ির প্ল্যাটফর্ম এবং সেখানে সামনেটা খোলা একটা ছোটো ঘর ছিল এবং এখনো আছে, রোদ-বৃষ্টি থেকে যাত্রীদের আশ্রয়স্থল। বাইরে রাস্তার উলটো দিকে ছিল একটা টিনের গুদাম। এ ছাড়া যতদূর মনে পড়ে স্টেশনে আর কিছু ছিল না। এখন যে বড়ো বিশ্রাম-কামরা এবং খাবার ঘর দেখি সেগুলি নেহাত হালে তৈরি হয়েছে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি গোটা-কয়েক গোরুর গাড়ি— কোনোটা খোলা, কোনোটা ছইওয়ালা। সেকালে না ছিল রিকৃশা, না ছিল মোটরকার কি বাস্‌। ওই একটা গোরুর গাড়িতেই যেতে হবে। মনটা বেশ খুশি হল, কেননা গোরুর গাড়িতে আগে কখনো চড়ি নি। দেশে যেতে গিয়ে কেবল নৌকা চড়েছি। এমন সময় কোদো বললে যে, আমাদের নিতে সে দ্বিপুবাবুমশায়ের বয়েল

গাড়ি এনেছে এবং আমাদের তাইতেই যেতে হবে। অতি অপরূপ ছিল সেই যান। দেখতে সেটি আজকালকার ছোটো এক বাসের মতো। আকারে ছোটো কিন্তু মজবুত কাঠে তৈরি— দুই দিকে দুটি করে জানালাও রয়েছে। জানালার খড়খড়ি ওঠানো নামানো যায়। পাদানের উপর ছিল একটি পাটাতন। পাদানের উপরে এবং পাটাতনের নীচে ছোটোখাটো জিনিসপত্র রাখাও চলে। আবার পাটাতনের মাঝখানের তক্তাটা ছিল এক দিকে মজবুত কব্‌জা দিয়ে আটকানো। সেই পাটাতনটি তুলে ভাঁজ করে উলটো দিকে শুইয়ে দিলেই গাড়ির মাঝখানটা ফাঁক হয়ে দু দিকে দুটো বেঞ্চি হয়ে যেত এবং তাতে পা ঝুলিয়ে ঠেঁসাঠেঁসি করে জন-ছয় আরোহী বেশ যেতে পারত। আমরা সেই ভাবেই বসলাম— ভোলাদাদা আর আমি একটা বেঞ্চে এবং কোদো অন্য বেঞ্চটায়। আমার বাক্স আর বিছানা রইল পাটাতনের উপর বেঞ্চের নীচে। গাড়ির চালকটি ছিল একজন মুসলমান— অনুসন্ধানে জানা গেল তার নাম আফতাবুদ্দিন, লোকে তাকে 'ন' বাদ দিয়ে আফতাবুদ্দি মিঞা বলেই ডাকে। দোহারা চেহারা, হাসিখুশি, মাঝবয়সী মানুষ— গোঁফদাড়িতে একটু পাক ধরেছে মনে হল। পরনে ছিল তার একটি লুঙ্গি, গায়ে একটা জামা এবং মাথায় সাদা কাপড়ের তিনকোনা টুপি। আর তার যে দুটি বলদ তারা ছিল দেখবার মতো। এমন নিটোল সুগোল ধবধবে সাদা রঙের বলদ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাদের শিং-জোড়াও ছিল একই ধাঁচের এবং কুঁজের গড়নটিও ছিল একই রকমের। দেখলেই মনে হত যেন দুটি যমজ ভাই। যাই হোক, নতুন ধরনের বয়েল গাড়ি চেপে কোদোর তত্ত্বাবধানে আমরা রওনা দিলাম শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে।

স্টেশন এলাকার বাইরে এসেই দেখি একটা রাস্তা গেছে বাঁ দিকে— শুনলাম সেটা গেছে অজয় নদীর পাড়ে ইলেমবাজার গ্রামের দিকে। পরে অনেকবার আমরা গেছি সেখানে চড়ুইভাতি করতে। আমরা চললাম সিধে উত্তর দিকে। দু ধারে মনিহারী দোকান, মুদির দোকান, পানের ও কাপড়ের দোকান। মাঝে মাঝে দু-একটা তামাকের দোকান থেকে মিষ্টি-গুড়ের সঙ্গে তামাকপাতার গন্ধ। এখনো যখনই শান্তিনিকেতনে যাই সেই মিষ্টি গন্ধ পাই— সে দোকানগুলিই আছে— সেখান থেকেই সে গন্ধ আসে, না আমার নাকে লেগে রয়েছে আর সেই রাস্তায় চললেই পাই সে গন্ধ— কে জানে। কোনো দোকানের সামনে ঝুলছে ডিট্‌জ্ লণ্ঠন, কোথাও বা দেখলাম কেরোসিনের টেবল-ল্যাম্প। খানিকটা চলেই এলাম একটা যেন চৌমাথার কাছে। শুনলাম ডান দিকে রাস্তা গিয়েছে হাট পেরিয়ে রেল লাইনের উপরের ব্রিজ দিয়ে সিয়ানডাঙার দিকে এবং বাঁ দিকের রাস্তা গেছে সুরুলের কুঠিবাড়ির দিকে আর সোজা রাস্তাটা চলে গেছে সিউড়ি শহরের পানে। সামনেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের দাতব্য-চিকিৎসালয়। কোদো বললে যে সেখানে বসেন হরিচরণ ডাক্তারবাবু, তিনিই প্রত্যহ একবার করে শান্তিনিকেতনে এসে ছেলেদের ও আশ্রমবাসীদের দেখে যান এবং

দরকারমত ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। পরে দেখেছি দ্বিপুবাবুমশায় তাঁর একজন নিত্যকার রোগী ছিলেন, অর্থাৎ অসুখ হোক আর না-ই হোক একবার করে ডাক্তারবাবুকে প্রত্যহই দ্বিপুবাবুর কুশল-সংবাদ নিতে হত। আমরা চললাম সিধে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লাল মাটির রাস্তা ধরে। অল্প একটু এগিয়েই ডান দিকে পড়ল একটি ছোট্ট গির্জা। সে গির্জা এখনো রয়েছে কিন্তু এখন রাস্তার উপরে বহু বাড়ি ঘরদুয়ার হয়ে প্রায় দেখাই যায় না। বাঁ দিকে একসারি খোলার ঘর। এগুলি পেরিয়ে এসে পড়লাম একটা প্রকাণ্ড খালি মাঠের মধ্যে। ডাইনে বাঁয়ে কোনো লোকালয় নেই। ধানকলের ধূমায়িত চিম্‌নি তখনো মাথা তুলে ওঠে নি। ডান দিকে যতদূর চোখ যায় মাঠ চলে গেছে রেল লাইনের উপরকার উঁচু পাড় পর্যন্ত। বোলপুর শহর ছাড়িয়ে গেলেই ছিল একটা উঁচু ডাঙা জমি। সেই ডাঙা জমিটা ডিনামাইট ফাটিয়ে দু ভাগ করে নীচের জমিটা সমতল করে তবে লাইন বসানো হয়েছিল। লাইনের দু ধারে বেশ উঁচু পাড় হয়ে উঠল স্তূপাকার আলগা মাটি দিয়ে। সেই শিশু বয়সে এই ঢিবিগুলিকে দূর থেকে বেশ পাহাড়ের মতোই আমার মনে হয়েছিল। সেই ঢিবির উপরে একটু অন্তর অন্তর ছিল এক-একটা তাল গাছ। বাঁ দিকে মাঠ ধূ ধূ করছিল।

এখন যেখানে ডাকবাংলা দেখতে পাওয়া যায় তখন সেখানে কিছুই ছিল না। সেই বিস্তার্ণ মাঠের উপর দিয়ে চলেছে লাল রাস্তা এবং তারই উপরে বেশ জোরেই চলেছে আফতাবুদ্দি মিঞার বয়েল গাড়ি। বোলপুর শহর ছাড়িয়ে প্রথম লোকালয় হল ভুবনডাঙার গ্রাম। কয়েকটি খড়ের চালা— একটি মুদির দোকান যেখানে কয়লা এবং কাঠও থাকত মজুত। গ্রামখানি ছাড়িয়েই ডান দিকে দেখলাম একটি গোরস্থান। কয়েকটি শান-বাঁধানো ইঁটের স্তূপ; না-জানি কোন্ অতীতের অজানা কোন্ নরনারীর দেহাবশেষ সযত্নে আগলে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ দিকে দেখলাম মস্ত বড়ো বাঁধ, যার উঁচু পশ্চিম পাড়ে একসার বড়ো তালগাছ নিস্তব্ধ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সারারাত্রি-দিনমান। বাঁধের এক পাশে বড়ো বড়ো কাশের গাছ— তখনো ফুল বের হয় নি। আরো একটু এগিয়ে বাঁ দিকে দেখলাম গাছপালা দিয়ে ঢাকা ছোটো একটি একতলা বাংলা। কোদো বললে, ওটাকে বলা হয় 'নিচুবাংলা' এবং ওটাতে থাকেন 'বড়োবাবুমশায়', অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

দ্বিজেন্দ্রনাথ। পরে শুনেছি নিচুবাংলা তৈরি হয়েছিল মহর্ষির থাকবার জন্যে, যত দিন শান্তিনিকেতনে দোতলা বাড়িটি না তৈরি হয়। বড়ো দোতলা বাড়িটি বাসযোগ্য হলে মহর্ষি সেখানে যান, পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিচুবাংলায় গিয়ে বসতি করেন। ডান দিকে আবার ধূ ধূ মাঠ গেছে পুবের দিকে রেল লাইনের ঢিবির দিকে এবং উত্তর দিকে চলে গেছে তালতোড় গ্রাম পর্যন্ত। নিচুবাংলা এবং শান্তিনিকেতনের সীমানা কোদো যা দেখাল আঙুল দিয়ে তার মাঝখানে ছিল একটা বেশ বড়ো মাঠ— সে মাঠে কোনো গাছপালা কি বাড়িঘর ছিল না সেকালে। নিচুবাংলা থেকে শান্তিনিকেতন একটু কমবেশি সিকি মাইল হবে। সেই পথটুকু অতিক্রম করে বাঁ দিকে দেখলাম একটি পাকা দোতলা ছোট্ট বাড়ি— পরে জানলাম তার নাম 'দেহলি'। আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে দেখলাম একটা খুব উঁচু ঢিবি। কোদো বললে যে 'কর্তামশায়', অর্থাৎ মহর্ষিদেব, যে একটি পুকুর খুঁড়বার চেষ্টা করেছিলেন, তারই মাটিগুলি জমা হয়ে একটা পাহাড় হয়ে গেছে। সেটি পেরিয়েই আমাদের বয়েল গাড়ি বাঁ দিকে মোড় ঘুরল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লাল রাস্তা সোজা চলে গেল গোয়ালপাড়া গ্রাম পেরিয়ে সিউড়ি শহরের দিকে। বাঁয়ে মোড় ফিরতেই দেখলাম আগাগোড়া লোহার ফ্রেমে কাচ-বসানো একটি মন্দির। তারই গায়ে পুবদিকে লোহার একটি উঁচু চূড়া। মন্দিরের ছাদ দেখলাম লাল টালির। পরে শুনেছি এককালে নাকি ছাদটাও ছিল পুরু কাচের। একবার ঝড়ে সে চাল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল; পরে টালি বসানো হয়। মন্দিরের উত্তর দিকে মস্ত বড়ো এক ফটক। এই ফটকটা হল শান্তিনিকেতনের উত্তরের প্রবেশদ্বার। তার দুই স্তম্ভের উপর প্রস্তরফলকে মহর্ষিদেবের ট্রাস্ট ডীডের প্রধান শর্তগুলি খোদাই করা রয়েছে। ফটকের উপর লোহার একটা ফ্রেমে টিনের পাতে লেখা রয়েছে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। বয়েল গাড়ি সেই ফটকের মধ্যে ঢুকল। রাস্তার দু ধারে একসার করে আমলকীর গাছ। সামনেই শান্তিনিকেতনের বড়ো দোতলা বাড়ি। গাড়ি থেকে নেমেই দেখি সামনের উত্তরমুখো বারান্দায় মস্তবড়ো একটা আরামকেদারায় বসে আছেন একজন গৌরবর্ণ ভদ্রলোক। কোদো ফিসফিস করে বললে, 'দ্বিপুবাবুমশায়'। কোদোর নির্দেশ অনুসরণ করে তার পিছন পিছন আমরা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গেলাম। সেখানে মাঝের

বড়ো হল্ কামরাটা পেরিয়ে দক্ষিণের গাড়িবারান্দার উপরকার খোলা ছাতটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কোদো খুব সসম্ভ্রমে আস্তে আস্তে বললে— 'বাবুমশায়'। বুঝলাম ঐখানে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। ভোলাদাদা গলা-খাঁকারি দিয়ে বারান্দায় গেলেন, আমিও গেলাম তার পিছু পিছু। ভোলাদাদা গিয়েই তাঁকে প্রণাম করলেন, দেখাদেখি আমিও করে ফেললাম। 'আরে এসো, এসো' বলে হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানিয়ে তিনি আমাদের পাশের দুটো চেয়ারে বসতে বললেন। এইবার তাঁর দিকে ভালো করে তাকালাম। বুঝলাম ইনিই রবীন্দ্রনাথ, এঁরই ইস্কুলে আমি পড়তে এসেছি। দেখলাম বেশ লম্বা চেহারা, মাঝবয়সী লোক, ধব্‌ধবে রঙ। পরনে সাদা থানের ধুতি এবং তার উপরে সাধারণ লংক্লথের পাঞ্জাবি। ঢোলা হাতাদুটোর মধ্যে বলিষ্ঠ বাহুদুটির খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। পরে শুনেছি যে যখন তিনি পদ্মাবক্ষে নৌকাতে থাকতেন তখন দাঁড় বেয়ে বেয়ে তাঁর হাত খুব চওড়া ও জোরালো হয়েছিল। পায়ে ঠন্‌ঠনের বিদ্যাসাগরী লাল চটি। বেশ সুন্দর দাড়িগোঁফের মধ্যে একটু একটু যেন পাক ধরেছে। দাড়ি তখন শেষ বয়সের দাড়ির মতো অত লম্বা হয় নি। নাকে গোল স্প্রিং-দেওয়া চশমা, গলায় জড়ানো কালো ফিতের সঙ্গে বাঁধা। সোনাদাদা যে ঠ্যাঙাড়ের বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে একেবারেই মিলল না! প্রশান্ত মুখের চেহারা দেখে এবং গলার মিষ্টি আওয়াজ শুনে কেমন যেন ভালো লাগল। শ্রদ্ধা ভক্তি সম্ভ্রমে মনটা ভরে গেল। তখন ঠিক বুঝি নি, বড়ো হয়ে যে গান শুনেছি 'হেরিলে হরে জ্ঞানমন প্রাণ পড়ে পদতলে'— সেইরকম একটা ভাব অস্পষ্টরকমে এসেছিল মনে। নানা কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসার পর বোধ হয় কিছু জলযোগও হয়েছিল। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ ডাকলেন— 'উমাচরণ।' একটি ছোটোখাটো লোক এসে দাঁড়ালে তার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, 'নীচে আপিসঘরে রাজেন্দ্রবাবুর কাছে এই দাদাবাবুকে নিয়ে যাও।' আমার রবীন্দ্র-পরিচয়ের প্রথম পর্ব শেষ করে সেই লোকটির সঙ্গে আমি নীচে চললাম। ভোলাদাদা বোধ হয় সেইদিন রাত্রেই কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন।

দোতলা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে একতলার উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা মাঝারি আকারের ঘরে গেলাম। দেখলাম মাটিতে ফরাশের উপর

একটি ডেস্কের সামনে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বুঝলাম ইনিই রাজেন্দ্রবাবু। রঙ বেশ ফরসা, মুখে ঘন কালো গোঁফদাড়ি। তিনি উমাচরণের কাছ থেকে কাগজটি নিয়ে পড়ে আমার দিকে একবার তাকালেন এবং ডেস্কের ডালাটি তুলে একখানা বাঁধানো বই বের করে কী সব লিখলেন। বুঝলাম যে আমাকে তিনি ভর্তি করে নিলেন। পরে অন্য একজন কাকে বললেন, 'একে ভূপেনবাবুর কাছে দিয়ে এসো।' পরে জানলাম ছেলেদের বাড়ি থেকে যে টাকাপয়সা আসত সব রাজেনবাবুর কাছেই জমা হত। প্রতি বুধবার তাঁর কাছে গিয়ে খাতা পেনসিল কালী কলম নিব সাবান ও বাড়িতে চিঠি লিখবার পোস্টকার্ড চেয়ে আনতে হত। তিনি প্রত্যেকের হিসেবে খরচ লিখে সে-সব জিনিস সরবরাহ করতেন। সব সময়ে চাইলেই জিনিস পাওয়া যেত না। 'গেল সপ্তাহে যে কালী দিলুম, তা কী করে ফুরোল', 'পেনসিল কেন হারাল'— সেই-সবের কৈফিয়ত দিতে হত। মাস্টারমশায়কে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। তিনি ছিলেন সেকালের কোষাধ্যক্ষ— একালের ছোটোখাটো অর্থসচিব আর-কি।

আমার বাক্স আর বিছানা তুলে নিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে খড়ের চালওয়ালা একটা ঘরের পাশ দিয়ে মস্ত একটা ইঁদারার গা ঘেঁষে সেই লোকটি আমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল লাল টালির দোচালা এক ঘরের সামনে। ওইটে শুনলাম ছেলেদের থাকবার এবং শোবার ঘর। ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন একটু বেঁটে কিন্তু বেশ গোলগাল উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ একজন ভদ্রলোক খালি গায়ে গলায় যজ্ঞোপবীত ঝুলিয়ে। বুঝলাম ইনিই ভূপেনবাবু। ইনিই ছেলেদের তত্ত্বাবধান করতেন। ছেলেদের ইনি কত যে স্নেহ করতেন তা পরে দেখেছি, আমিও সে স্নেহ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। তিনি আমাকে 'এসো বাবা' বলে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখলাম দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি পাতা রয়েছে কয়েকটা তক্তপোশ। তখনো সব ছেলেরা ফেরেন নি, সেইজন্যে কয়েকটা তক্তপোশ খালিই ছিল। তারই একটা দেখিয়ে বললেন, 'এইটে তোমার, বিছানাটা খুলে ফেলে পেতে নাও। বাক্সটা তক্তপোশের নীচেই রাখো।' তার পর যে-সব ছেলেরা বিদ্যালয় খোলার দু-একদিন আগেই এসে পড়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁরা খুব উৎসুক হয়ে, আমি কোথা থেকে আসছি, কাদের

বাড়ির ছেলে, ইত্যাদি সব জেনে নিলেন। তাঁদের খবরও আমার কতকটা জানা হয়ে গেল। সন্ধ্যাটা ছেলেদের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটালাম। ছেলেরা সবাই রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে হলে তাঁকে গুরুদেব বলতেন। আমিও সেইদিন থেকেই তাঁকে গুরুদেব বলে আসছি। রাত্তিরে ছেলেদের সঙ্গে খেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। ট্রেনে আসার দরুন শরীরটা ক্লান্তই ছিল। তবু ঘুম আসে না। মনে পড়ছিল মায়ের মুখ, বাবা ও ভাইবোনদের কথা। পরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মায়ের কোল ছেড়ে এসে পড়লাম আশ্রমজননীর কোলে। বয়স তখন আমার দশ থেকে এগারোর মধ্যে।
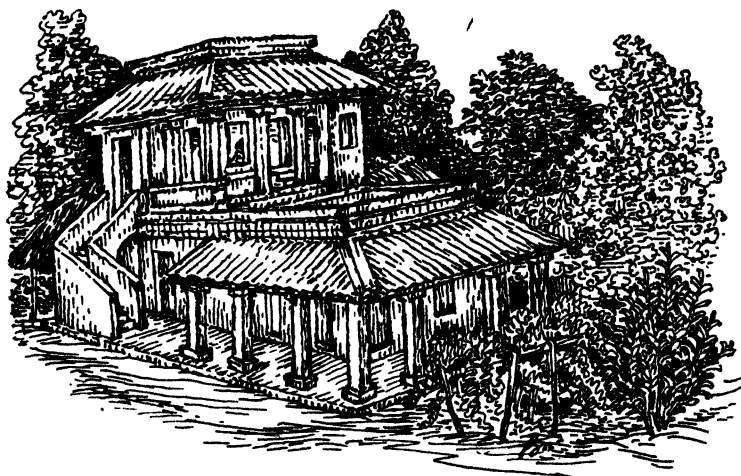
তৃতীয় অধ্যায় [দেহলি

আমি যেদিন আশ্রমে পৌঁছলাম তার পর দিন ছিল বুধবার, আশ্রমের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তার পরদিনই বিদ্যালয় খুলবার কথা। সকালবেলার জলযোগ সেরে সারা শান্তিনিকেতনটা ঘুরে দেখে এলাম। আশ্রমের এলাকাটি আয়তনে চতুষ্কোণ— বিশ-বাইশ বিঘা জমি হবে। তখনকার দিনের শান্তি-নিকেতনের চারি দিকে ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর। আশ্রম-এলাকার দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছিল সবুজ ধানক্ষেত এবং উত্তরে ছিল লাল কাঁকরের খোয়াই। ভুবনডাঙার গ্রাম-ছাড়ানো রাঙামাটির পথ বেয়ে এলে প্রথমেই দেখা যেত নিচুবাংলা যেখানে থাকতেন গুরুদেবের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখা যেত দেহলি— এ কথা আগেই বলেছি। দেহলিতে গুরুদেব অনেকদিন ছিলেন। উত্তর-পুব কোনায় একটি পুকুর কাটা হয়েছিল কিন্তু বর্ষাকাল ছাড়া সেখানে জল থাকত না। মাটি স্তূপীকৃত হয়ে একটা পাহাড়ের মতো হয়ে গিয়েছিল, তারই উপরে পুবমুখো একটা উপাসনা-বেদী ছিল মহর্ষিদেবের প্রভাতের উপাসনার জন্যে। ওই পুকুরের পশ্চিম পাড়েই ছিল কাচের মন্দির, যার কথাও আগে বলেছি। তার দক্ষিণে ছিল দোতলা বাড়ি যেখানে গুরুদেবকে প্রথম দেখি। উত্তর-পশ্চিমে গোটা দুই-তিন ছাতিম গাছ ছিল। তারই নীচে ছিল মহর্ষিদেবের সান্ধ্য উপাসনার

বেদী। একটি পাথর দিয়ে বাঁধানো বড়ো চাতালের উপর একটু উঁচু করা মর্মর বেদী— বেদীর পিছনে দাঁড় করানো ছিল বেদীর মাপে একটি প্রস্তরফলক। তারই উপরের দিকটায় লেখা ছিল 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল বেশ বড়ো টিনের রান্নাবাড়ি, খাওয়াদাওয়া হত সেখানে। দক্ষিণমুখো ছিল ছোটো একতলা বাড়ি। তাতে ছিল তিনটি কামরা— একটিতে লাইব্রেরি, একটিতে বিজ্ঞানাগার এবং একটি ছিল অতিথির জন্যে। তারই পুবের দিকে উত্তর-দক্ষিণে টানা বারান্দাযুক্ত টালির দোচালা ঘর যেখানে আমরা থাকতাম। এখন সে ঘরে আর কেউ থাকে না, তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে পুরানো দিনের নিদর্শন হিসাবে 'প্রাক্‌কুটির' নাম দিয়ে। বড়ো ইঁদারাটার উত্তরে ছিল একটি খড়ের ঘর যেখানে দু-একজন মাস্টারমশায় থাকতেন। আর দু-একটি চালাঘর ছাড়া শান্তিনিকেতনে তখন আর কোনো বাড়িঘর ছিল না। বড়ো দোতলা বাড়ির দক্ষিণে শিউলি গাছের বীথি চলে গিয়েছিল সামনের ফটক পর্যন্ত। এই ফটকের দুই ধারের স্তম্ভের গায়ে মার্বেল পাথরে খোদাই করে লেখা ছিল মহর্ষিদেবের ধর্মমতের কতকগুলি সারমর্মকথা। ফটকের উপরে ছিল বৃত্তাকারে একটি মালতী না মাধবী ফুলের লতানে গাছ যার নীচে বসত অঙ্কের ক্লাস। তারই পুবে ছিল আম্রকুঞ্জ যেখানে এখনো প্রতি বৎসর বসে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন-সভা। একসার শালগাছ ছিল আশ্রমের দক্ষিণ সীমানা— তারই গায়ে ছিল লাল কাঁকরের রাস্তা 'দেহলি' থেকে লাইব্রেরি-বাড়ি পর্যন্ত। ঘরবাড়িতে তখন আশ্রমবাসীদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হত না। যে দিকেই চোখ ফেরাতাম চোখ জুড়িয়ে যেত। ভোরের বেলা পুবের দিকে চাইলে দেখতে পাওয়া যেত সূর্যোদয়ের সোনালি শোভা মাঠের ওপারের রেল লাইনের উঁচু দিঘির উপরকার তালগাছের ফাঁক দিয়ে। ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি পশ্চিম দিগন্তে অস্তমান রক্তিম গোলকের গায়ে গৃহাভিমুখী রাখাল ও তার গোরুগুলির চলন্ত কালো ছায়াছবি। অপূর্ব সে-সকল দৃশ্য মানসপটে এঁকে রেখে গেছে আশ্রমজননীর ক্ষমাসুন্দর স্নেহাবনত মুখচ্ছবি।

আমি যখন প্রথম আশ্রমে আসি তখন মোহিতবাবু— মোহিতচন্দ্র সেন— ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ। বেশ মোটাসোটা শ্যামবর্ণ ছিল তাঁর চেহারা। গুরুদেবের তেরো শ দশ সালে প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থ' তিনিই সম্পাদন করেছিলেন। যতদূর

শুনেছি, তিনি সিটি কলেজের বেশি মাইনের কাজ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন গুরুদেবের আদর্শের আকর্ষণে। আমার যাওয়ার কিছুদিন পূর্বেই সতীশচন্দ্র রায় মারা যান— তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সতীশবাবু অতি অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন, কিন্তু ওই স্বল্পপরিসর জীবনেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন তার কথা গুরুদেবের মুখে অনেকবার শুনেছি। তারই সমবয়সী ছিলেন বোধ হয় অজিতবাবু— অজিতকুমার চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগী এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্যে মশগুল। বড়ো হয়ে পড়েছি অজিতবাবুর লেখা। সে সময় সাময়িক পত্রে গুরুদেবকে লক্ষ্য করে যে-সব অসংগত সমালোচনা বের হত, তার পালটা জবাব দিতেন অজিতবাবু ক্ষুরধার ভাষায়। সে সময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং গল্পলেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই আসতেন আশ্রমে এবং অজিতবাবুকে মদৎ দিতেন। হরিবাবু এবং জগদানন্দবাবু দুজনেই ঠাকুরবাবুদের জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন আশ্রমে আসবার আগে। আগের দিনের অভ্যাসমত এঁরা দুজনেই গুরুদেবকে বলতেন 'বাবুমশায়'। হরিবাবু ছিলেন গৌরবর্ণ মার্জিতদেহ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন। গুরুদেবের নির্দেশমত তিনি ছেলেদের জন্যে 'সংস্কৃতপ্রবেশ' লিখেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রধান একটি কাজ ছিল বাংলা অভিধান সংকলন। আজও মনে পড়ে, দিনের কাজ শেষ করে সান্ধ্যাহ্নিক সেরে লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে কুয়োর ধারে খড়ের চালাঘরের পশ্চিমের জানালার কাছে রেখে হরিবাবু তাঁর বাংলা অভিধানের জন্যে শব্দ সংগ্রহ করে পাণ্ডুলিপি লিখছেন। সে কাজের বিরাম ছিল না, শেষ ছিল না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটেছে অভিধানের কাজে। গুরুদেবের উৎসাহের উদ্দীপনায় কাজ করে গিয়েছেন হরিবাবু অক্লান্তভাবে। যে কাজ তিনি আরম্ভ করেছিলেন আমার দশ বছর বয়সে, তার সম্পূর্ণ রূপ তিনি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন আমার পঞ্চাশ বছর বয়সে। সেই পরিশ্রমের এবং অধ্যবসায়ের পুরস্কার এবং সেই নিষ্ঠার মর্যাদা ও গৌরব তিনি নিজের জীবদ্দশায়ই পেয়ে গিয়েছেন তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানের দেশব্যাপী প্রশংসায়। জগদানন্দবাবু ছিলেন কৃষ্ণকায়। আশ্রমের দক্ষিণ গেটের বাইরে একটি খড়ের ঘরে তিনি থাকতেন তাঁর ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে। সন্ধ্যার দিকে তিনি একটু

বেড়াতেন মাঠে মাঠে খালি গায়ে। কাপড়খানা কোঁচা না করে সেটিকে লম্বা করে গলায় দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। পায়ের চটি থেকে গোড়ালির সিকি অংশ বেরিয়েই থাকত এবং সেইজন্যে চটিজুতোর সামনেটা শুকিয়ে উপরের দিকে গুটিয়ে বেঁকে উঠত। মুখে থাকত কালো রঙের বর্মা চুরুট। চলনসই সুন্দর বেহালা বাজাতেন জগদানন্দবাবু— তবে সে বাজানো মামুলি প্রথা-মতে নয়। দাঁড়িয়ে বেহালাটিকে বুকের উপরে না রেখে এবং গাল দিয়ে তাকে চেপে না ধরে, তিনি বেহালা বাজাতেন বসে বসে, নিজের ভুঁড়িটির উপর বেহালাটি আলগোছে রেখে। জগদানন্দবাবুর হাসিটি ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের হাসির উল্টো ধরনের। দ্বিজেন্দ্রনাথের হাসি ছিল অত্যন্ত খোলা এবং উঁচু পর্দায় বাঁধা অট্টহাসিরই মতো। নিচুবাংলায় তিনি হাসলে দেহলিতে তা শোনা যেত। জগদানন্দবাবু হাসতেন নীরবে— তাতে আওয়াজ হত না, শুধু চোখ-দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ত। জগদানন্দবাবুর স্নেহশীলতার কথা বলে শেষ করা যায় না। এ বিষয়ে কয়েকটি কথা পরে বলব। রাজেন্দ্রবাবু আর ভূপেন সান্ন্যাল মশায়ের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। গুরুদেবের মধ্যম জামাতা সত্যবাবুও আশ্রমে থাকতেন। তিনি বিকেলের দিকে আমাদের শরীরতত্ত্ব পড়াতেন। খেলাধুলায় ছিল তাঁর খুব উৎসাহ। আর দিনুবাবুর কথা কী বলব। তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপুবাবুর একমাত্র পুত্র। তিনি আমাদের গান শেখাতেন, মাঝে মাঝে ইংরেজিও পড়াতেন। বিশালকায় পুরুষ ছিলেন তিনি। দিনুবাবুকে প্রথম প্রথম একটু ভয় পেতাম— কিন্তু তাঁর স্নেহ ছিল অপরিসীম। গানের ক্লাসের ছেলেদের খুব ভালোবাসতেন। দিনুবাবুর কথা বলতে গেলেই তাঁর সহধর্মিণী কমল-বৌঠানকে মনে পড়ে। মিষ্টভাষিণী স্নেহময়ী রমণী ছিলেন তিনি।

আমি শান্তিনিকেতনে যাবার কিছু পরেই এলেন শাস্ত্রীমহাশয়— বিধুশেখর ভট্টাচার্য। এসে কিছুদিন পরে তিনি কলকাতায় গেলেন এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে। আমরা ছোটোরা অবাক যে মাস্টারমহাশয়কেও পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার পর ফিরে তিনি হরিবাবুর সঙ্গেই প্রথমে থাকতেন। অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ— স্বপাক খেতেন। পরে তিনি পালিভাষার চর্চায় লেগেছিলেন। তিনি বড়ো ছেলেদের সংস্কৃত পড়াতেন। আরো কিছুদিন পরে এসেছিলেন নগেন

আইচ মহাশয়। · তিনি এসেছিলেন ড্রইং মাস্টার হয়ে। আমাদের সকলকে ড্রইং ক্লাসে যেতেই হত। ড্রইং পেনসিলটা ধরতে শিখতেই লেগে গেল হপ্তাখানেক। লেখবার পেনসিলটা যেমন গোড়ার দিকে শক্ত করে ধরা হয়, ড্রইং পেনসিলের বেলায় নাকি তা চলতেই পারবে না। ড্রইং পেনসিলটাকে ধরতে হবে মাঝামাঝি জায়গায় অতি আলগোছে এবং ছোটো ছোটো আঁচড় মেরে সোজা লাইন টানতে হবে। আমার হাতের কায়দা দেখে মাস্টার-মহাশয় বোধ হয় হপ্তা দুয়েই আমার সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে নগেনবাবু আমাদের বাংলাও পড়াতেন। বেশ দুলে দুলে সুর করে দাড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে তিনি আমাদের নদী কবিতাটি মুখস্থ করিয়েছিলেন। জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে পড়েছি মনে আছে, তবে সেটা আশ্রমবাসের গোড়ার দিকে না শেষের দিকে মনে নেই। পরে তিনি জামসেদপুরের একটি বিদ্যালয়ে হেডমাস্টার হয়ে চলে যান। জীবনের শেষ দিকে জ্ঞানবাবু আবার আশ্রমে ফিরে এসে বাড়ি করে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করে গিয়েছেন।

আমার আশ্রমবাসের গোড়ায় আমরা একুনে পনেরো কি ষোলোটি বিদ্যার্থী সেখানে একত্রে বাস করতাম। অরবিন্দদা ও অজিতবাবুর ভাই সুজিতদা আমি যাবার অল্প পরেই এনট্রান্স পাস করে কলকাতায় পড়তে চলে যান। সুজিতদা খুব অল্প বয়সেই মারা যান। পূর্ববঙ্গের উপেনদা (ভট্টাচার্য) সুজিতদাদের সঙ্গেই পড়তেন কি না মনে নেই। উপেনদা পরে অধ্যাপক হয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরই তিনটি ভাই সত্যেন, লব ও কুশ পরপর এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সন্তোষদার মেজো ভাই ভোলা খুব নম্র স্বভাবের ছেলে ছিলেন। তিনি আর আমি বরাবরই এক ক্লাসে পড়তাম। গুরুদেবের ছোটো ছেলে শমী আমাদের সঙ্গে পড়তেন। শমী হুবহু গুরুদেবের মতো দেখতে ছিলেন— একই রকম রঙ, মুখের গড়ন ও চোখের চাহনি। গানও করতেন খুব চমৎকার। ভোলার ছোটো ভাই সর্বেশ, যাকে আমরা 'সবি' বলে ডাকতাম, তিনিও কিছু পরে আশ্রমে এসেছিলেন। ভোলার মতো সবিও খুব অল্পবয়সে মারা যান। তিনি ছাত্রমহলে খুব প্রিয় ছিলেন— শান্তিনিকেতনে তাঁর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ 'সর্বেশ কাপ' এখনো রয়েছে। অজিতবাবুর ছোটো ভাই সুশীল আমাদের নীচে পড়তেন। তাঁর গানের

গলা ছিল খুব ভালো। সুশীলের তর্ক করবার যে একটা বাতিক ছিল, পরম্পরায় শুনেছি এখনো তা ঘোচে নি। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ছেলে অরুণচন্দ্রও ছিলেন আশ্রমে। অরুণদার চেহারা ছিল লম্বা রোগা। তাঁর কাপড়চোপড়ের দিকে বিশেষ খেয়াল ছিল না। পড়াশুনায় ভালো বলেই খ্যাতি ছিল। পরে তিনি কলকাতায় কলেজে অধ্যাপক হয়ে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। বরিশাল অঞ্চলের খ্যাতনামা স্বদেশী নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের দুটি ছেলে— যোগরঞ্জন ও প্রেমরঞ্জন পড়তেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। যোগরঞ্জনদা আশ্রমেই মারা যান। সেই বোধ হয় মৃত্যুকে আমি প্রথম দেখি সামনাসামনি। ফরাসী চন্দননগরের বাসিন্দা গৌরগোপাল ঘোষ ছিলেন খুব স্ফূর্তিবাজ খেলোয়াড়— যেমন ছিল শরীরের গড়ন তেমনি ছিল তাঁর গায়ের জোর। গুরুজনেরা তাঁকে ডাকতেন 'গোরা' বলে। তাঁর নামের সঙ্গে গায়ের রঙের কিছুটা মিল ছিল। তাঁকে গৌরদা বলতাম আমরা ছোটোরা। গৌরদা পড়াশুনা শেষ করে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে কাজ করে গিয়েছেন আমরণকাল। গৌরদা মারা যাবার পরে লাইব্রেরির সামনে মাঠটার নামকরণ হল 'গৌরপ্রাঙ্গণ'। আমি যাবার দিন দুই-তিন আগে এসেছিলেন একটি ছিপছিপে রোগা ধবধবে রঙের ছেলে। নাম তার নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। শুনেছিলাম তাঁর বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়, মা ছিলেন ব্রহ্মদেশীয়। চমৎকার হাসিখুশি ছেলে ছিলেন তিনি। সিল্কের লুঙ্গির উপর বেঁটে কোট গায়ে দিয়ে মাথায় সিল্কের রুমাল বাঁধলে খুব মানানসই দেখাত। বয়সে আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়ো ছিলেন কিন্তু স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত ছেলেমানুষ। আমি যেদিন বিকেলে আমাদের দোচালা বাসগৃহে এলাম সেদিন দেখি দেবলদা কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছেন সামনে যে একটা ডোবা ছিল তারই মধ্যে। দেবলদা পড়তেন গৌরদার সঙ্গে আমাদের এক ক্লাস উপরে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে দেবলদা কলকাতায় কলেজে পড়বার সময় একবার অক্সফোর্ড মিশন ছাত্রাবাসে ছিলেন। পাদরী হোম্‌স্‌ সাহেব তখন সেই ছাত্রাবাসের কর্তা। ছেলেরা রুটিন করে পড়াশুনা করেন এটা তিনি খুব পছন্দ করতেন এবং তেমনি অপছন্দ করতেন রুটিন অমান্য করলে। অর্থাৎ রুটিনে যদি থাকে ইংরেজি তখন অঙ্ক কি অন্য কোনো বিষয় পড়তে দেখলে তিনি বিরক্ত হতেন।

দেবলদার ছিল রুটিনে অরুচি— কিন্তু রুটিনের ব্যতিক্রম হয়ে গেলে হোম্‌স্ সাহেব বিরক্ত হবেন বলে তাঁর দিবানিদ্রাটির সময়, রুটিনে যা লেখা থাকত সেটিকে কেটে, ছোট্ট করে ইংরেজিতে এস. টি. লিখে রাখতেন। হোম্‌স্ সাহেবের ধরবার ছোঁবার উপায় রইল না। এস. টি. মানে হল সিরিয়াস থিংকিং অর্থাৎ ঘুম! বহু বৎসর পরে শান্তিনিকেতনে যখন প্রথম পোস্ট আপিস খোলা হল, দেবলদা হয়ে পড়লেন পোস্টমাস্টার। দেবলদাকে দেখে কে! 'ও দেবলদা, একটা পোস্টকার্ড দাও-না' বলে বার-তিনেক চেঁচাবার পর শুনেছি নাকি সামনের খাতাটা থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলতেন, 'গোল কোরো না, দেখছ না সরকারী কাজ হচ্ছে? এত তাড়া কিসের?' অল্প কদিন পরেই এলেন নরেন খাঁ। মুসলমান নন— খাঁটি ব্রাহ্মণ। রঙ আমার চেয়ে কমসে কম দুই পোঁচ ঘন। অপ্রস্তুত হলেই জিভ কাটতেন। পড়তেন আমার নীচের ক্লাসে। মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে সুদক্ষ ছিলেন। বহু কালের কথা— ভুলে গেছি আর কারা ছিলেন তখন। যাঁরা ছিলেন কিন্তু নাম করতে পারলাম না তাঁরা আমার স্মৃতির ক্ষীণতাপ্রসূত অপরাধ ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি।

সেকালে আশ্রমে যারা কাজকর্ম করত তাদের মধ্যে কোদোর কথা আগেই বলেছি— অতি কালো এবং অতি বলিষ্ঠ ছিল সে। জল তোলাই ছিল তার কাজ। মুখে হাসি লেগেই ছিল। গুরুদেবের বাহন উমাচরণের সঙ্গে প্রথম দিনেই পরিচয় হয়। কেমন মেয়েলি ধরনে সরু গলায় কথা কইত। লেখাপড়ার নামগন্ধও জানত না— জানবার বাসনাও বিশেষ পরিলক্ষিত হয় নি কখনো। আমরা পরে অনেকসময় বলেছি, 'ওহে উমাচরণ, তুমি এত বড়ো কবির সঙ্গে ঘর করছ, দুটো কবিতাও পড়তে শিখলে না হে?' সে বলত, 'আপনারাই তো শিখছেন দাদাবাবু, তা হলেই হল।' পরে একবার তাকে বলেছিলাম, 'জান উমাচরণ, বিলেতে ডাক্তার জন্‌সনের বাহন বস্‌ওয়েল সাহেব তার প্রভুর কী জীবনবৃত্তান্তই না লিখেছে! আর তুমি কী করছ হে?' অম্লানবদনে হেসে প্রশ্ন করল— 'সে ডাক্তারবাবুটি কে দাদাবাবু?' বুঝলাম এর আর কোনো আশাই নেই। একটি সাঁওতাল ছেলেকে মনে পড়ে— সে রোজ সন্ধ্যায় লণ্ঠনগুলিকে ঝেড়ে মুছে ঘরে ঘরে দিয়ে যেত। নামটি তার ভুলে গেছি— হাঁটত একটু থপ্‌থপ্‌ করে, বুদ্ধির বেশি প্রসার তার হয় নি।

রান্নাঘরের ভাণ্ডারী বিপিন, যাকে আমরা ম্যানেজার আখ্যা দিয়েছিলাম, তাকে বেশ মনে আছে। সে ধুতিটা কোমরে না পরে পরত পেটের উপরে প্রায় বুকের কাছে। দুষ্টু ছেলেরা বলত যে, ও খেয়ে খেয়ে যে ভুঁড়ি করেছে সেইটে লুকোবার জন্যেই এইরকম করে কাপড় পরে। ওর ছিল এক অ্যাসিস্ট্যান্ট — নামটা তার ভুলে গেছি— তাকে আমরা বলতাম সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট। নুন জল লেবু পরিবেশন করত সে। স্পষ্ট মনে আছে রোগা লম্বা সতীশ ঠাকুর আর মোটা বেঁটে চণ্ডী ঠাকুরকে। রাঁধত কিন্তু ভালো। কিংবা হয়তো ক্ষিধের তাড়নায় আমাদের সবই ভালো লাগত। প্রতি বুধবার আসত সাবু আর হোরি আব্বাস। সাবু ছিল ধোবা— মিশকালো রঙের উপরে কানের ফুটোয় রিং-এর মতো কুণ্ডল-দুটি খুবই খোলতাই হত। তার বাচ্চা গাধাটার 'পরে চড়ে নি এমন ছেলে কমই ছিল। একজন ছেলে ভেবেছিল সাবু মানেই ধোপা— কী কারণে একদিন সাবুর 'পরে বিরক্ত হওয়ায় এক মাস্টারমহাশয়কে বলেছিল— 'মহাশয়, একজন নূতন সাবুর বন্দোবস্ত না করলেই নয়— যা কাপড় ছিঁড়ছে বলা যায় না।' নাপিত ছিল আব্বাস। তার পোশাকী একটা নাম ছিল— গুরুদাস বোধ হয়— কিন্তু সবাই তাকে আব্বাস বলেই জানত এবং ওই নামেই ডাকত। 'ওহে আব্বাস, ইংরেজি জান?' জিজ্ঞাসা করায় সে একবার হেসে বলেছিল, 'জানি বৈকি দাদাবাবু, তবে কতকাল আগের কথা।' সেই থেকে আমরা তাকে খুব ধরে বসতাম, 'ওহে আব্বাস, তোমার সেই ইংরেজি বক্তৃতাটা এনাদের একবার শুনিয়ে দাও-না হে।' মনমেজাজ ভালো থাকলে আব্বাস দাঁড়িয়ে উঠে হাত নেড়ে নেড়ে মাঝে মাঝে গমক দিয়ে খুব খানিকটা বিড় বিড় করে 'হোরি আব্বাস' বলে বক্তৃতাটা শেষ করে বসে পড়ত। সেইজন্যে তার নামই হয়ে গেল হোরি আব্বাস। আজকালকার নাপিতের মতো সে বাঁ হাতের তেলোয় চট্‌পট্‌ আওয়াজ করে ক্ষুর ধার দিত না, সে ক্ষুর ধার দিত তার ডান পায়ের হাঁটুর নীচের চামড়াটার উপরে, সে কথা এখনো মনে আছে। তার ভোঁতা ক্ষুরের টানে অনেকের গালে রক্তপাত হয়েছে।

আর মনে আছে লিক্‌লিকে রোগা, দন্তহীন, গালে-টোপ-খাওয়া এক বৃদ্ধকে। সে খাটো ধুতির উপর চামড়ার কোমরবন্ধ পরে খালি গায়ে লাঠি হাতে বোলপুর আর শান্তিনিকেতন যাতায়াত করত দিনে দু বার করে।

পিয়ার্সন সাহেবের ক্লাস
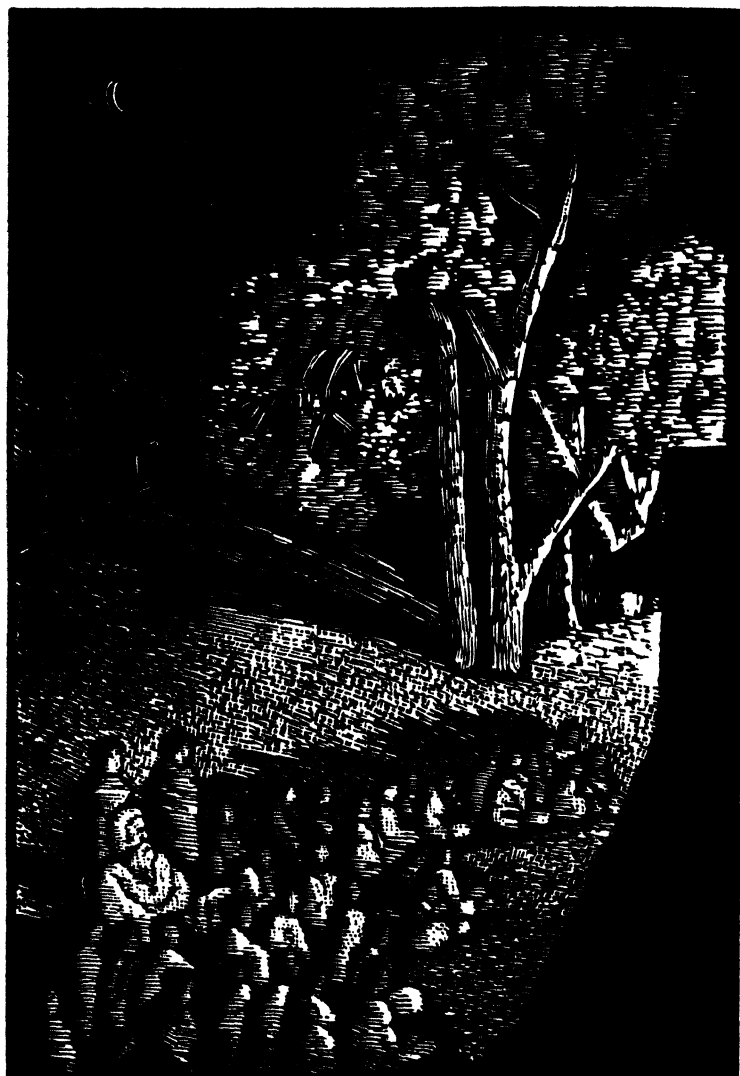
সাহিত্যসভা

সে ছিল আমাদের ডাকহরকরা। তাকে আমরা ডাকতাম সর্দার বলে। তার জীবনের ইতিহাস অল্পই শুনেছি তার কাছে, বেশির ভাগটাই কিংবদন্তী— লোকপরম্পরায় শোনা কাহিনী। তার উপরে রঙ চড়িয়েছে আমাদের তরুণ মনের কল্পনা। তার ইতিহাস যেটা আমরা গড়ে তুলেছিলাম সেটা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিত। ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তার কোনো প্রমাণ নেই। আমাদের তখনকার বয়সে প্রমাণের দরকারই হত না। ভালো লাগলেই বিশ্বাস করতাম। ইতিহাসটা সংক্ষেপে এই :

সে নাকি ছিল বীরভূমের নামকরা এক ডাকাতের দলের সর্দার। বোলপুর রেল স্টেশন থেকে সিউড়ি পর্যন্ত যে লাল রাস্তা চলে গেছে তারই আশেপাশে সে দলবল নিয়ে বিচরণ করত। ভুবনডাঙা গ্রাম ছাড়িয়ে এসেই যে উঁচু ডাঙা জমিটা যার উপরে এখন আশ্রম হয়েছে সেখানে আগে ঘরবাড়ি গাছপালা কিছু ছিল না, গোটা-দুই ছাতিম গাছ ছাড়া। সেই ছাতিমগাছগুলি ছিল সিউড়ির রাস্তা থেকে পশ্চিমের দিকে খানিকটা দূরে। এই ছাতিমতলায় তারা এসে ঘুপ্‌টি মেরে বসত সন্ধ্যার পর। লাল রাস্তা দিয়ে বোলপুর থেকে লোকেরা যেত গোয়ালপাড়া পেরিয়ে সিউড়ি শহরের দিকে। সুবিধা বুঝে এরা তাদের 'শিকার' করত। অর্থাৎ লুটপাট করে যা-কিছু পেত কেড়ে নিত। আক্রমণের ঠিক আগেই জয়ধ্বনি করে উঠত তারা— 'হারে রে রে রে রে'। অনেক সময় যাত্রীদের হাতেও লাঠিসোটা থাকত— তখন হত ভীষণ লড়াই। সে কী পাঁয়তাড়া আর সে কী লাঠিচালনার কায়দা! পারবে কেন সে-সব যাত্রীর দল এই-সব পেশাদার লাঠিয়ালের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সর্দারের দলেরই জিত হত। লুঠের টাকা ও মালপত্র সর্দার সবাইকে ভাগ করে দিত, নিজেও নিত। দলের মধ্যে ঐক্য ছিল একান্ত দরকার ; তাই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে সন্দেহ হলে তাকে চরম শাস্তি দেওয়া হত— অর্থাৎ তাকে আর পরে খুঁজেও পাওয়া যেত না। একবার এইরকম সন্দেহ নাকি পড়েছিল সর্দারের জামাইয়ের উপর। সে থাকত বর্ধমানের কাছে মানকর না কী একটা গ্রামে। বোলপুর থেকে যেতে আসতে পঁচিশ ক্রোশ পথ। কর্তব্যের কাছে আত্মপর ভেদ নেই। সর্দার নিজেই নাকি ভার নিল দুষ্টদমনের। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইয়া মস্ত রনপা চড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল সর্দার জামাইয়ের বাড়ির দিকে। সেখানে জামাইয়ের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করে রাতারাতি

ফিরে এসে দলের লোকেদের জানালে কী প্রতিবিধান সে করে এসেছে। এক রাত্তিরে পঞ্চাশ মাইল রনপা করেও যাওয়া যায় কি না আমাদের মনে সে প্রশ্নই ওঠে নি, জিজ্ঞাসা করে গল্পের রসভঙ্গ করবার চেষ্টাও করি নি। তবে এটা শুনেছি যে সেদিনের পর সর্দারের জামাইকে আর কেউ চোখে দেখে নি। এইরকম করে দিন যায়, মাস যায়। একদিন সন্ধ্যার সময় সর্দার বের হল তার সাঙ্গপাঙ্গ সমভিব্যাহারে শিকার করতে। ছাতিমতলায় এসে দেখে একজন প্রৌঢ় বয়সের লোক হাত জোড় করে বসে রয়েছেন গাছের তলায় জোড়াসন কেটে পশ্চিমদিক-পানে চেয়ে। ধব্‌ধবে ফরসা তাঁর গায়ের রঙ। মুখ ভরা তাঁর দাড়ি, পরনে লম্বা জোব্বা। সর্দার ও তার চেলাচামুণ্ডারা ভাবলে যে আজকে একটা ভারী শিকার তাদের বরাতে জুটেছে এবং দিন-কতক স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। লম্ফ দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল সবাই— 'হারে রে রে রে রে'। লোকটি একবার চোখ খুলে বললেন, 'তোমরা ক্ষণকাল অপেক্ষা করো, আমার প্রার্থনা শেষ হয় নি— শেষ হলে যা ইচ্ছে কোরো।' শুনে সাঙ্গোপাঙ্গরা হেসে উঠল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সর্দারের দিকে চেয়ে। সর্দারের মুখচোখের ভাবই যেন বদলে গিয়েছে। স্তিমিতনেত্র সাধকের সৌম্য মুখচ্ছবি সর্দারের চোখে নাকি অনির্বচনীয় মহিমায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল— সর্দার চেয়েই আছে। দেখে দেখে সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। নিজের জামাইকে গুম করেও যার চক্ষের পলক পড়ে নি, সেই সর্দারের চোখ নাকি জলে ভরে এল। অবশ্যমৃত্যুর সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মানুষ যে সমাহিত চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারে এ দৃশ্য সর্দার তো কখনো দেখে নি— এ ধারণা তার মনের ত্রিসীমানায় কখনো আসে নি। সমস্ত মনপ্রাণ তার লুটিয়ে পড়ল সেই ধ্যানরত সাধু পুরুষটির পায়ে। সর্দারের ইশারায় তার দলের লোকেরা চলে গেল খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সর্দার বসে রইল হাত জোড় করে সেই মহাপুরুষের মুখের দিকে চেয়ে। উপাসনান্তে সাধক চাইলেন সর্দারের পানে। কী করুণাই ভরে উঠেছিল সেই ক্ষমাসুন্দর চক্ষের চাহনিতে যা সর্দারের উত্তপ্ত মনকে শীতল করে দিয়েছিল তার অজানিতে। মস্তক তার অবনত হয়ে পড়ল সেই সিদ্ধপুরুষের চরণে। লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে সর্দার তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাইল। সাধক তার মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। ধ্যাননিমগ্ন সাধু পুরুষটি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

তিনি সেবার রায়পুরের সিংহবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। একদিন বিকেলে একাকী বিচরণ করতে করতে সেই ছাতিমতলায় এসে পড়েছিলেন।

সেই থেকে সর্দার মহর্ষিদেবের আশ্রয়ে এল এবং মহর্ষি রায়পুরের সিংহ-বাবুদের কাছ থেকে ঐ ডাঙাজমিটা কিনে সেই ছাতিমতলায়ই তাঁর উপাসনা-বেদী স্থাপন করলেন এবং শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। সংক্ষেপে এই হল সর্দারের জীবনের ইতিহাস। এর কতটা সত্যি এবং কতটা কাল্পনিক, কতটা প্রামাণিক এবং কতটা আমরাই জুড়ে দিয়েছিলাম সে কথা আলোচনার কোনো প্রয়োজন দেখি না। মোট কথা হচ্ছে সর্দারকে ঘিরে একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী আমাদের মনের কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল, আর তাইতেই আমরা খুশি হয়েছিলাম। সেই ডাকাতের দলের সর্দার আমাদেরই ডাকহরকরা একথা ভাবতেই মন খুশি হয়ে উঠত। ছেলেদের এবং মাস্টারমহাশয়দের বাড়ির চিঠি সে সর্দার বোলপুর ডাকখানা থেকে নিয়ে আসত আর দিয়ে আসত। এখনো মনে পড়ে ছিপ্‌ছিপে, রোগা, বয়সের ভারে ঈষৎ অবনত বৃদ্ধ মানুষটি হেঁটে আসছে রাঙামাটির পথ বেয়ে— হাতে তার লম্বা লাঠি, কোমরে তার চামড়ার কোমরবন্ধ, কাঁধে তার ডাকের ঝুলি। আমরা অনেক সময় তাকে ধরে বসতাম, 'সর্দার, সেই হুঙ্কারটা একবার শুনিয়ে দাও-না।' সে হেসে এড়াবার চেষ্টা করত। খুব বেশিরকম ধরে পড়লে এবং মনমেজাজ ভালো থাকলে সর্দার দাঁড়িয়ে পড়ত— মাথায় গামছাটি বেঁধে দুই হাতে বড়ো লাঠিটা ধরে বারকতক পাঁয়তারা কষে ও লাঠিটা বন্‌ বন্‌ করে ঘুরিয়ে সে আচমকা ডাক ছাড়ত— 'হারে রে রে রে রে'। শুনে আমাদের গায়ে দিত কাঁটা! কিন্তু পরক্ষণেই টোপখাওয়া গালে দন্তবিহীন মুখে একটু হেসে বলত, 'সে কী দিন গেছে দাদাবাবু, কী দিনই না গেছে।'

বিদ্যালয় খোলার আগের বুধবারের মধ্যে বাকি ছেলে ও মাস্টারমহাশয়রা সব ফিরে এলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ হল। একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা শুতে গেলাম। পরের দিন অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙল ঘণ্টার আওয়াজ শুনে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কর্মস্রোত আবার প্রবাহিত হল, আমিও সেই প্রবাহের মধ্যে ভেসে চললাম।

আমাদের দিন শুরু হত সূর্যোদয়ের পূর্বে, অতি প্রত্যুষে— যতদূর মনে আছে গ্রীষ্মকালে সাড়ে চারটেতে এবং শীতকালে পাঁচটা বাজলে। ঘুম থেকে উঠে বিছানাটি ঝেড়ে গুটিয়ে রাখতে হত আর সেইসঙ্গেই নিচু গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতাম—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে।

এই মন্ত্রটি ভূপেনবাবু আমাদের শিখিয়েছিলেন। কেই বা লোকেশ এবং চৈতন্যময় অধিদেবতারই বা স্বরূপ কী কে তখন তা জানত। সে-সব তথ্য আমাদের শিশুমনের ধারণার বাইরে ছিল। এখনো যে ধারণায় সেটি আয়ত্ত করতে পেরেছি এ দাবি করতে পারি নে। কিন্তু এটুকু ভূপেনবাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম নিয়ে দিনের কাজে লাগতে হয়। ভগবান বলে যে কেউ একজন আছেন এবং তিনি যে প্রাতঃস্মরণীয় এটুকু বোধই তখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যে ধারণাটা মনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে এসে পড়ল নিত্য উচ্চারণের অভ্যাসে সেটা যে ভিতরে ভিতরে দানা বাঁধা ছিল তা তখন উপলব্ধি না করলেও জীবনের এই সায়াহ্নবেলায় তা অনুভব করছি এ কথা বলবই।

অন্ধকার থাকতেই আমাদের প্রাতঃকৃত্য সেরে নিতে হত। তার পর পালা করে নিজেদের ঘরটি পরিপাটি করে ঝাঁট দিতে হত। তার পর পড়ত স্নানের ঘণ্টা। গাবতলার বড়ো কুয়োর ধারে, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক—

ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হত। সে এক পর্ব বললেই হয়। কেরোসিন টিনের মুখে কাঠের এড়ো শক্ত করে পেরেক দিয়ে আটকিয়ে তার মধ্যে দড়ি বেঁধে কোদো কুয়োর থেকে জল তুলে বাঁধানো চৌবাচ্চাগুলি ভরে দিত এবং আমরা মগে করে জল তুলে গায়ে মাথায় দিতাম। বাসি জল শীতকালে ভয়ানক ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, গায়ে দিলেই গা শিউরে ওঠে। কোদোকে একটু খোসামোদ করলে এক টিন সদ্য তোলা ঈষতুষ্ণ জল পাওয়া যেত—সে কী আরাম। কোদো সে কী বড়ো বড়ো টান দিত দড়িতে—দেখতে দেখতে উঠে আসত জলভরা টিন। পরে আমরা যখন বড়ো হলাম তখন আমরা নিজেরাও জল তুলেছি কোদোর অনুকরণে। যে-সব ছোটো ছেলে ভালো করে স্নান করতে পারত না, কিংবা আলস্যভরে, কি শীতের প্রকোপে, স্নান করতে চাইত না, তাদের ধরে ধরে স্নান করিয়ে দিতেন ভূপেনবাবু। কারও গায়ে খোস-পাঁচড়া থাকলে সেজন্যে ঘৃণা কি অবহেলা তাঁর ছিল না।

স্নান সেরে যে যার পট্টবস্ত্র ও চাদর পরে নিতাম। সদ্যঃস্নাত দেহে পাট-কাপড় পরলে মনে যে একটা শুচিতা-সঞ্চার হয় বালক বয়সে তা সম্যক্‌ভাবে না বুঝলেও মনটা বেশ খুশিতে ভরে উঠত। উপাসনার ঘণ্টা পড়লেই নিজ নিজ কম্বলাসনে পছন্দমত নির্জন জায়গায় পাঁচ-সাত মিনিটের জন্যে উপাসনায় বসতে হত। উপাসনার তাৎপর্য কিছু জানা ছিল না, মনে মনে কী প্রার্থনা করতে হবে তাও কেউ শিখিয়ে দেন নি। এইটুকু শুধু বুঝেছিলাম যে শুদ্ধদেহে শান্ত চিত্তে ভগবানের নাম করতে হবে। প্রথম প্রথম এদিক ওদিক চাইতাম, দেখতাম অন্যরা কী করছে। মাঝে মাঝে যে দু-একটা কাঁকর কাঠবিড়ালীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারি নি তাও বলতে পারি নে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পাঁচ-সাত মিনিট চুপ করে বসবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল এবং সেইসঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে ভগবানকে ডাকবার ইচ্ছাও যে কখনো হয় নি তাই বা কী করে বলি। এই ক্ষণকাল সমাহিতচিত্তে বসবার অভ্যাসটি যে পরবর্তী জীবনে কোনো কাজেই আসে নি তাও বলতে পারি নে। ঘণ্টা পড়লে সবাই উঠে পড়ে আসনটি ঝেড়ে নিতাম— ঠিক তখনই দেখতাম যে দেহলির দিক থেকে গুরুদেব ধীর পদক্ষেপে হেঁটে আসছেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সময়মত তিনি আসতেন। মানসনেত্রে এখনো দেখতে পাই প্রাক্‌কুটিরের সামনেকার শালবীথির লাল

কাঁকরের রাস্তা ধরে তিনি আসছেন আমাদের সঙ্গে সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে। আমরা সারি দিয়ে দাঁড়াতাম এবং লাইনের সামনে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে গুরুদেব প্রার্থনা করতেন, ওঁ পিতা নোঽসি! পিতা নো বোধি। আমরাও তাঁর স্বরের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে সমগ্র স্তোত্রটি উচ্চারণ করতাম। এখনো মনে পড়ে গুরুদেবের ধ্যাননিবিষ্ট প্রশান্ত মুখের উজ্জ্বল ছবি। সমবেত উপাসনা শেষ হলে আমরা একে একে তাঁকে প্রণাম করে নিতাম এবং তিনি হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানিয়ে আশীর্বাদ করতেন আমাদের সবাইকে। সে আশীর্বাদ আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে আমাদের জীবনে। গুরুদেব আশ্রমে থাকতে একটি দিনও এই সমবেত উপাসনায় তাঁকে অনুপস্থিত দেখি নি।

সমবেত উপাসনার পর পট্টবস্ত্র ছেড়ে ধুতি কি পাজামা কি প্যাণ্ট, আর শার্ট কি পাঞ্জাবি এবং তার উপর গেরুয়া আলখাল্লা পরে নিতাম। তার পরই পড়ত জলখাবারের ঘণ্টা। সকালবেলায় কোনোদিন পেতাম ভেজানো ছোলা কিংবা ভেজানো কাঁচা মুগের ডাল। এখো গুড় অথবা আদা নুন দিয়ে ছোলা বা কাঁচা মুগ মন্দ লাগত না খেতে। কোনোদিন বোঁদে, কোনোদিন জিবে গজা, কখনো বা মোহনভোগ। তার পর দুই হাতা দুধ। অনেক সময় দুধের টান পড়লে টিনের দুধও খেয়েছি। বিকেলের জলখাবারটা হত সকালের সঙ্গে মানিয়ে। অর্থাৎ সকালে মোহনভোগ হলে বিকেলে বোঁদে কি গজা, আর সকালে বোঁদে কি গজা হলে বিকেলে পেতাম মোহনভোগ। বিকেলে যতদূর মনে পড়ে দুধ পাওয়া যেত না। তবে মাঝে মাঝে লুচি ও একটা কিছু ভাজি পাওয়া যেত। আমাদের কেউ কেউ 'মোহনভোগ' কথাটা শুনলেই মুখ বিকৃত করে বলতেন— 'মোহনভোগ, না সুজির কাই— না আছে ঘি, না আছে চিনি— ছ্যা।' তার পর যেতে হত পড়ার ক্লাসে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম মামুলি স্কুল ছিল না। শহরের বোর্ডিং স্কুলগুলিকে গুরুদেব ভয় করতেন এবং সেগুলিকে মনে করতেন বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই একগোষ্ঠীভুক্ত। তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যাতে বিদ্যাশিক্ষা-দানের কল বা কারখানায় পরিণত না হয় সে দিকে ছিল তাঁর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি। তপোবনের গুরুগৃহের যে ছবি গুরুদেব মানসচক্ষে দেখেছিলেন তারই সাদৃশ্যে মহর্ষির সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে তিনি তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে-

ছিলেন। বদ্ধ ঘরের দম-আটকানো সংকীর্ণতা বিদ্যার্জনের পক্ষে অনুকূল নয় এই ছিল তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস। সুতরাং শান্তিনিকেতনে ক্লাসঘরের কি টেবিল-চেয়ারের বালাই ছিল না। কানমলা, হাঁটুগাড়া, নিজের কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার অপমান আমাদের ভুগতে হত না। আশ্রমের এক-একটি নির্জন স্থানে পল্লবিত তরুছায়ায় মাস্টারমশায়কে ঘিরে নিজ নিজ কম্বলাসনে বটুবিদ্যার্থী আমরা বসতাম বইখাতাপত্র নিয়ে— সেই ছিল আমাদের ক্লাস। প্রভাতের নির্মল বাতাস আমাদের সদ্যঃস্নানস্নিগ্ধ দেহমনকে সজাগ সতেজ ও উৎসুক করে দিত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যার্জনের ব্রতে। ভগবৎকৃপায় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল গুরুদেবের কাছে পড়বার। সাহিত্যসাধনার শত কাজের মধ্যেই সময় করে ছোটো ছোটো ছেলেদের তিনি পড়াবার ভারও নিতেন, ছোটোদের পাঠ্য-পুস্তকও রচনা করতেন। 'ইংরেজি সোপান' বলে দু-তিন খণ্ড ইংরেজিভাষা-শিক্ষার বই তিনি লিখেছিলেন। মুখে মুখে আমরা তাঁর কাছ থেকে ইংরেজি শিখতাম। তাঁর নির্দেশমত হরিবাবু লিখেছিলেন 'সংস্কৃতপ্রবেশ'; সে বইয়ের এক-একটি অধ্যায়ের শেষে অমরকোষের এক-একটি শ্লোক থাকত— যেমন চন্দ্রসূর্যের কী কী নাম, কোন্ কোন্ শব্দে 'ষ' লিখতে হবে। বালক বয়সে শেখা 'হিমাংশুশ্চন্দ্রমাশ্চন্দ্র ইন্দুঃ কুমুদবান্ধবঃ' এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে আছে। 'ঈষৎ কোষ' শ্লোকটি যখন আয়ত্ত করতে পারা গেল তখন 'স' ও 'ষ' এর মধ্যে আর কোনো গোলযোগ হবার সম্ভাবনাই রইল না। গুরুদেব কখনো পড়াতেন ইংরেজি কখনো বা বাংলা।

সাড়ে-দশটা কি এগারোটার সময় সকালের ক্লাস শেষ হয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পালা আসত। তখনকার দিনে ছেলেদের জন্যে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিকে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের থালা বাটি গেলাস নিয়ে সার বেঁধে খাবার ঘরের দিকে রওনা দিতাম। গুরুদেব মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে বসে খেতেন। তাঁর নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ছিল না। একদিন এই সারিতে, আর একদিন অন্য সারিতে যেখানে খুশি বসে পড়তেন। আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম— হায় রে, যদি আজকে আমার পাশে বসেন! গুরুদেবের পাশে বসবার একটা তো আগ্রহ ছিলই, তার উপরে আবার ছিঁটে-ফোঁটা প্রসাদও পাওয়া যেত— নরম মোটা হাতরুটির অন্তত আধখানা। সে সময়কার দুজন ঠাকুরের কথা আগেই বলেছি। সতীশ ঠাকুর ছিল

ছিপছিপে রোগা এবং চণ্ডী ঠাকুর ছিল বেঁটে মোটা গাঁট্টাগোট্টা ধরনের মানুষ। সতীশ ঠাকুর একটু মিতভাষী গম্ভীর, কিন্তু চণ্ডী ঠাকুর ছিল গপ্পী মানুষ, হাসিখুশি। কিন্তু উভয়েই আমাদের রুচির খবর রাখত। কে খাইয়ে, কে ডাল ভালোবাসে না, কে চায় কেবল ঝোলের পটল, এ-সব তাদের জানা ছিল এবং পারতপক্ষে রুচিসংগত পরিবেশনই করত। এদের উপরে ছিল বিপিন— তাকে বলা হত ম্যানেজার। সে ডাকে সে বেশ খুশিই হত। বিপিন চারি দিকে চোখ রাখত কার কী লাগে। আর-একজন লোক ছিল সে পিতলের বড়ো জাগে করে জল দিয়ে বেড়াত। লোকটির বোধ হয় একটু আধটু আফিম খাবার অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে সে ঝিমোত। বিপিন তাকে মোটে পছন্দ করত না। আমরা মাঝে মাঝে 'জল, জল' বলে হাঁক দিলে বিপিন বিরক্তির সুরে বলত— 'জল তো ঘুমচ্ছেন'। মধ্যাহ্নভোজনের সময় পাওয়া যেত গরম ভাত এবং চায়ের চামচের দু চামচ ঘি। ডাল হত বেশির ভাগই অড়হর, মাঝে মাঝে মুসুরি এবং কদাচিৎ মুগ। তার সঙ্গে দিত পাতলা পাতলা আলুভাজা কিংবা ঢেঁড়স ভাজা ও কদাচিৎ পটল ভাজা। বর্ষার দিনে যখন আলু বেশি পাওয়া যেত না তখন কচি কচি কচু ভাজাও খেয়েছি। একটা কুমড়োর ঘ্যাঁট এবং শেষে বেশ কড়া করে সাঁৎলানো আলুর ঝোল। তাতে মাঝে মাঝে পটলও পড়ত। আলুর অভাবে খামালু দিয়েও কাজ সারা হত। অনেক লোকের রান্না হত বলেই হোক, কি সতীশ ও চণ্ডী ঠাকুরের কেরামতির জন্যেই হোক, সেই ঝোলটা ছিল খুব মুখরোচক। পরবর্তী কালে বাড়িতে সেরকম রান্না করবার চেষ্টা করা হয়েছে বহুবার, কিন্তু কিছুতেই তেমনটি হয় নি। হয়তো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখের স্বাদই বদলে গেছে, বাড়ির রান্নায় কোনো ত্রুটি হয় নি। এইসঙ্গে রাত্রের খাবারের তালিকাটাও দিয়ে ফেলি। ভাত কি হাতরুটি যার যেমন রুচি। রুটিতে একটু ঘি মাখানো থাকত। ডাল হত অড়হর কি ছোলা। তার সঙ্গে পাওয়া যেত হয় নরম করে আলু পেঁয়াজ ভাজা নয়তো আলু-পোস্ত। মাঝে মাঝে আলুর বদলে ছোটো ছোটো দিশি পেঁয়াজ দিয়ে পোস্ত। তার পর সেই আলু-পটলের ঝোল। দ্বিতীয়বার করে ডাল আর ঝোল পরিবেশনের রীতি ছিল দুবেলাই। রাত্রে দুই হাতা করে দুধ বরাদ্দ ছিল প্রত্যেকের। আহারান্তে নিজেদের থালা বাটি গেলাস মেজে তুলে রাখতে হত। পরে দেখেছি, কাঁসার

থালার বদলে কাঠি দিয়ে গাঁথা শালপাতায় খাওয়া হত। দুপুরের খাওয়া শেষ হলে পালা করে অতিথিসেবায় লাগতাম। সে কাজে উৎসাহী ছিল অনেক ছেলে। খাবার পর দিবানিদ্রার রেওয়াজ ছিল না। যে যার নিজের তক্তপোষে, গুটিয়ে-তোলা বিছানায় ঠেসান দিয়ে বিকেলের পড়াটা ঝালিয়ে নিতাম।

বিকেলে আবার ঘণ্টা-দুই ক্লাস হত। এই সময়ে বেশির ভাগ হত জগদানন্দবাবুর ল্যাবরেটরি ঘরে গিয়ে বিজ্ঞানচর্চা। ছোট্ট কটি আলমারিতে নানারকমের জিনিস থাকত। তাই দিয়ে হত আমাদের কত গবেষণা। কেমন করে মেঘ হয়, কেমন করে তা আবার গলে জল হয়ে যায়, বুঝে নিলাম পাঁচ মিনিটে। একটি মাঝারি ডিক্যানটারে কিছু জল দিয়ে তার নীচে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালালে সে জল থেকে বাষ্প উঠতে লাগল এবং সেই বাষ্প একটা সরু নল দিয়ে আর-একটা ডিক্যানটারে ঢুকে পড়ল, আর সেই ডিক্যানটারের গায়ে ঠাণ্ডা জল দিতে না দিতে সে বাষ্প জল হয়ে যেতে লাগল। একটা গোল চাকতিতে ছিল রামধনুর সাতটা রঙ পাশে পাশে আঁকা। সেই চাকতিটা জোর করে ঘোরালেই সব রঙ একাকার হয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেল। বোঝা গেল চোখে যে সাদা আলো দেখি তার মধ্যে সাতটা রঙই রয়েছে গোপনে। কেমন করে ইলেকট্রিক ট্রামগাড়ি চলে, কেমন করে একটা পাত্রকে একেবারে হাওয়া-শূন্য করা যায়— আরও কত কী গবেষণা ও পরীক্ষা হত। এর সঙ্গে হত পদার্থবিজ্ঞানের সামান্য একটু আমেজ-মেশানো কত খোশগল্প। সে-সব পড়া নিতান্তই ছেলেমানুষি ধরনের সন্দেহ নেই কিন্তু এতে করে আমাদের কৌতূহল সজীব ও উন্মুখ হত, আরও জানার আগ্রহ সতেজ হয়ে উঠত। সত্যবাবু পড়াতেন ফিজিওলজি। মস্ত বড়ো বড়ো ছবি ছিল মনুষ্যদেহের বিচিত্র যন্ত্রগুলিকে চেনাবার জন্যে। তারই সাহায্যে সত্যবাবু মনুষ্যদেহের কলকব্জা সব মোটামুটি বুঝিয়ে দিতেন সরস ও সহজ ভাষায়। হৃৎপিণ্ডের কাজ কী, শিরা-উপশিরাগুলির কোন্‌টার মধ্যে লাল রক্ত শরীরকে পুষ্ট করে আর কোন্‌টার মধ্যে দিয়ে দূষিত নীল রক্ত ফুসফুসে গিয়ে তাজা বাতাসে চাঙ্গা হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়, সে-সব তথ্য অল্পের মধ্যে একরকম জানা হয়েছিল। হজম হয়

কোন্ কোন্ রসে এবং কোথায় তারও হদিশ কিছু পেয়েছিলাম। একটি নরকঙ্কাল ছিল একটা কাঠামে ঝোলানো। তা ছাড়া মড়ার মাথা ও হাড় অনেক ছিল।

এইখানে আর-একটা কথা মনে পড়ছে, তার উল্লেখ করি। বর্ষার দিনে কালো মেঘে অম্বর মেদুর হয়ে যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামত তখন আমরা পাত-তাড়ি গুটিয়ে মাস্টারমশায়দের একজনের সঙ্গে বের হয়ে পড়তাম বৃষ্টির ধারায় ভিজে শরীরটা জুড়াতে। বৃষ্টির জল তখন মাঠের থেকে খোয়াইয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর নানা ছোটো ছোটো ধারায় এগিয়ে গিয়ে পরস্পর মিলে মিশে মোটা ধারা হয়ে ছুটেছে কোপাই নদীর দিকে। আমরাও তার অনুসরণ করে ছুটতাম বর্ষার গান গেয়ে গেয়ে। অচিরে কোপাই নদীর মরা গাঙে বান এসে পড়ত। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তাম সেই নদীর জলে। বানের টানে ভেসে যেতাম কত কেয়াঝোপের পাশ দিয়ে, কত কাশ ফুলে ঢাকা উঁচু পাড়ের তলা দিয়ে। বেশ কিছুদূর গেলে দেখা যেত রেল-লাইনের সাঁকো। সেটা বড়ো সর্বনেশে জায়গা। সাঁকোর নীচে জলের তলায় লুকিয়ে থাকত কত বড়ো বড়ো পাথর। সেখানে কোপাইয়ের জল ফুলে ফেনিল হয়ে উঠত। তার মধ্যে পড়লে আর রক্ষা নেই— হাত-পা তো ভাঙতেই পারে— আর যদি পা তার ফাটলে পড়ে যায় তবে রিষ্টাশঙ্কা খুবই জোর। সেজন্যে দূর থেকে সাঁকো দেখতে পেলেই পাড়ের দিকে কানি খেতে খেতে নদীর পাড়ে উঠে পড়তে হত। তত-ক্ষণে বৃষ্টি হয়তো থেমে গেছে। তখন ভিজে কাপড়টা নিংড়ে নিয়ে ঘরে ফেরার পালা। ফেরা হত রেল লাইন ধরে। লাইনের দুই পাশে বড়ো বড়ো তাল গাছে তালগুলিতে তখন পাক ধরতে শুরু করেছে মাত্র। কী করে লাইনের পাথর মেরে তাল পাড়া যায় তা চক্ষে না দেখলে প্রত্যয় হওয়া কঠিন। আমাদের মধ্যে কয়েকজনের হাতের টিপের খ্যাতি ছিল। যদি একটা তাল পড়ত তবে তার আঁটি নিয়ে যে টানাটানি শুরু হত তার হিড়িক চলত প্রায় আশ্রমে পৌছনো পর্যন্ত। ততক্ষণে পরনের কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেছে। আশ্রমে ফিরেই কাপড় ছেড়ে আমাদের খেতে হত গরম আদার চা— একেবারে অমৃতসমান। এই জলে ভেজায় আমাদের দেহমনের শ্রান্তি অনেক লাঘব হত। শরীর সহনশীল তো হতই, প্রকৃতির সঙ্গে মিলে সহজে আনন্দ করবার শক্তি ও অভ্যাসটাও বেড়ে যেত। কালবৈশাখীর ঝড়ে উড়তে দেওয়ায় কিংবা

বর্ষার মুষলধারার সঙ্গে ভাসিয়ে দেওয়াতে মানবমনের যে একটা অপরিসীম চরিতার্থতা আছে তা ঐ অল্প বয়সেও অনুভব করেছি।

বিকেলে ক্লাস শেষ হলে জলযোগ সেরে ছুটতাম সকলে খেলার মাঠে। কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবের 'ব্যাক' খেলোয়াড় গৌরদার হাতেখড়ি হয়েছিল শান্তিনিকেতনের ঐ খেলার মাঠে। কোনো কোনো ছেলে বাগান করত। একটু একটু জমি এক-একজনকে বিলি করা হত। কেউ-বা করত অড়হর ডাল, কেউ-বা করত চিনেবাদামের চাষ, আবার কেউ লাগাত ঢেঁড়স। বড়ো কুয়োটার কাছ থেকে নালা কেটে স্নানের জলের ধারা এনে ক্ষেতে জল দেওয়া হত। কেউ যদি জমি পেয়ে তার যত্ন না করত বা তার জমিতে আগাছা জন্মাত তবে তার জমি বাজেয়াপ্ত করে যার জমিতে খুব ভালো চাষ হত তাকে দেওয়া হত। জমি বাজেয়াপ্ত হওয়ার মতো অপমান আর কিছু ছিল না। পরে একবার একজন মাস্টারমশায়ের খেয়াল হল ছেলেদের চামড়া-শোধনের কাজ শেখাতে হবে। বড়ো বড়ো জালায় গোলা হল ফিটকিরি আর কী কী সব মশলা। বর্ষার দিনে মাঠে ঘাটে বিস্তর হেলে সাপ দেখা যেত। ছেলেরা লেগে গেল হেলে সাপ মেরে তার চামড়া রোদে শুকিয়ে ঐ জালার মধ্যে ডোবাতে। কত হেলে সাপ যে মারা গেল তার লেখাজোখা রইল না।

আগেই বলেছি আমাদের প্রত্যেকের একটি করে কাঠের কাজের হাতিয়ার-ভরা বাক্স ছিল। একজন জাপানী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর কাছে আমরা ছুতোরের কাজ খানিকটা শিখেছিলাম। নিজেদের জন্যে ডেস্ক, শেলফ ও ছোটো আলনা চলনসই রকম তৈরি করে নিতে শিখে গেলাম। সেই জাপানী ভদ্রলোক— নাম তাঁর ভুলে গেছি— একবার দুটো সত্যিকার নৌকো তৈরি করবার আয়োজন করে ফেললেন। তাঁর নির্দেশমত কাঠগুলি আমরা ধরে থাকতাম— তিনি সেগুলি চেঁছে-ছুলে করাত দিয়ে প্রমাণসই করে কেটে নৌকোতে লাগাতেন। মাঝে মাঝে আমাদের দিতেন দু-একটা মোটা কাজ— যেমন র‍্যাঁদা দিয়ে একমেটে করে চাঁছা। পরে তিনি সেটাকে তাঁর মনের মতো করে মসৃণ করে চেঁছে নিতেন। যখন নৌকো-দুটি সম্পূর্ণ তৈরি হল তখন তাঁর আর আমাদের উল্লাস দেখে কে। আমরা এমন ভাব করতে লাগলাম যেন কাজটা আমরাই হাসিল করে ফেলেছি। একটি নৌকোর

নাম হল ‘সোনার তরী’, সেটি ছোটো, তার খোলটার আকৃতি ছিল সমুদ্রের জাহাজের মতো। অন্যটির নাম দেওয়া হল ‘চিত্রা’, সেটি ছিল আকারে বড়ো, তার তলাটা চ্যাপটা। নৌকা দুটির নিজ নিজ নাম, সামনের গলুইয়ের একপাশে লিখে, তাদের তালদিঘিতে ভাসানো হল। ছুটিছাটার দিন নৌকা-বিহার করবার অনুমতি পাওয়া যেত। এই জাপানী ভদ্রলোক আমাদের যুযুৎসুও শেখাতেন। এ বিদ্যেয় গৌরদা দেখতে না-দেখতে পারদর্শী হয়ে গেলেন। সে কত কায়দা, কত-না প্যাঁচ। গৌরদাকে এঁটে ওঠা যেত না কিছুতেই। কত রকম পাঁয়তাড়া, আর কী করে মাটি নিতে হবে সে-সব গৌরদার যেন মুখস্থ হয়ে গেল। ওস্তাদ যে পাশ থেকেই গৌরদাকে কায়দা করে আছাড় মারতেন তৎক্ষণাৎ মাথাটা এক পাশে কাত করে কাঁধের উপর ভর দিয়ে মাটিতে দড়াম করে পড়েই চট করে লাফিয়ে দাঁড়ানো গৌরদার সহজেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। শত্রুপক্ষের হাতটাকে কেমন সহজে মুচড়ে পিঠের কাছে নিয়ে তাকে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চল করে ফেলা যায় সে কায়দায় গৌরদা এত সিদ্ধহস্ত হয়ে পড়লেন যে আমরা ভয়ে তাঁর সামনে হাতই বাড়াতাম না। ঐ জাপানী ভদ্রলোকটির উৎসাহের অন্ত ছিল না। তখন রুশ-জাপানের ঘোর যুদ্ধ চলছে। দিনুবাবু ছড়া বাঁধলেন— ‘চা পান করিয়া ছুটিল জাপান রুশিয়ার ’পরে রুষিয়া’ এবং আরও কত কী ভুলে গেছি। যেদিন ‘টেলিগ্রাফ’ কাগজে খবর এল যে রুশিয়ার সারা বলটিক নৌবহরটি অ্যাডমিরাল টোগোর নৌযুদ্ধকৌশলে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর গর্ভে তলিয়ে গেছে, সেদিন উৎসাহের চোটে ঐ জাপানী মানুষটি যেন ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আমরা বোলপুর শহরটি প্রদক্ষিণ করে এলাম দিনুবাবুর রচিত গান গেয়ে— ‘জয় জয় জয় হে জাপান।’

খেলাধুলার পর হাত পা ধুয়ে সান্ধ্য উপাসনা সেরে আমাদের দিনের কাজ শেষ হত।

সন্ধ্যার পর পড়াশুনার রেওয়াজ ছিল না। তখন শুরু হত বিনোদনপর্ব। যাঁদের কণ্ঠে সুর ছিল তাঁরা যেতেন গানের ক্লাসে। গান শেখানো হত তানপুরা ও এসরাজের সঙ্গে— হারমোনিয়ামের চল ছিল না। কোনো-দিন গান শেখাতেন অজিতবাবু, কোনোদিন বা দিনুবাবু। দিনুবাবু ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারী। দিনুবাবুর যে কী গলা ছিল আর কী দরদ দিয়ে গাইতেন তিনি— কী করে বোঝাব তাঁদের যাঁরা সে গান শোনেন নি। কথা ও সুর যেন অভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করত যখনই তিনি গান করতেন। মনে পড়ে শেলির একটি কবিতার দুই ছত্র, ছাত্রাবস্থায় যার তর্জমা করেছিলাম—

'Music when soft voices die,
Vibrates in the memory'

ঠিক সেইভাবেই দিনুবাবুর গানের রেশ স্মৃতির বীণায় গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে এই বৃদ্ধ বয়সেও। 'নৈবেদ্য'র গানগুলি সকলে মিলে শিখতাম আর গাইতাম—

'আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো হে।'

কিংবা

'যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।'

এবং আরও কত কী। গীতাঞ্জলির গানগুলি তখন ছাপা হয়ে বের হয় নি; এবং যেমন যেমন লেখা হত গুরুদেব তখনকার তখনই দিনুবাবুকে শিখিয়ে দিতেন, আমরাও দিনুবাবুর কাছ থেকে টাটকা টাটকা শিখে নিতাম। আমাদের মনে হয়, সে-সব গানের তুলনা নেই। সময়ে সময়ে গুরুদেব

নিজেই গানের আসর জমিয়ে বসতেন। প্রথাসিদ্ধ ওস্তাদ গাইয়েরা পরে এসেছিলেন।

আমাদের একটা খেলা হত মাঝে মাঝে, ইংরেজিতে যাকে বলে sense training— এটাতে গুরুদেবের খুবই উৎসাহ ছিল। সকলকে নিয়ে এক-সঙ্গে বসে হাতে একটা ফুটরুল তুলে তিনি বলতেন— 'এই দেখো, এক ফুট এতটা লম্বা। আচ্ছা, এই দেখো টেবিলের এই পাশটা। বলো তো এটা লম্বায় কত ফুট কত ইঞ্চি।' আমরা সবাই খুব বিজ্ঞের মতো সেই দিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে মনে মনে একটা আঁচ করে নিতাম ; তার পর কেউ বলতেন 'চার ফুট দুই ইঞ্চি', কেউ বলতেন 'তিন ফুট এগারো ইঞ্চি'— এইরকম যার যা প্রাণ চায় এক-একজন এক-একটা মাপ বলতেন। তার পর টেবিলের সেই পাশটা ফুটরুল দিয়ে মেপে দেখা হত, যার আন্দাজ আসল মাপের সবচেয়ে কাছাকাছি হল তারই হত জিত। এইভাবে, এই দেয়ালটা লম্বায় কত, এই দরজাটা কতটা উঁচু, এখান থেকে ঐ ফুলদানিটা কত দূরে, এই-সব নিয়ে মাপামাপি চলত খাবার ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত। আমাদের মনোবৃত্তিগুলিকে সজাগ করবার চেষ্টা হত সব দিক দিয়েই।

এক-একদিন এক-একজন মাস্টারমশায় গল্প বলতেন। কত নূতন দেশের কথা, কত বিচিত্রজাতি মানুষদের কত রকমারি জীবনযাত্রার বিবরণ এবং তাদের শৌর্যবীর্যের কত-না কাহিনী। পালা করে মাস্টারমশায়রা গল্প বলতেন। অজিতবাবু সত্যবাবু এবং জগদানন্দবাবুর গল্পের আসর ভরতি থাকত। বস্তুত, আমরা এঁদের গল্পের ক্লাসের জন্যে উৎসুক হয়ে থাকতাম। জগদানন্দ-বাবুর গল্পের তুলনা ছিল না— যেমন তাঁর বলার ভঙ্গি, তেমনি চিত্তাকর্ষক তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। তখন 'স্ট্র্যাণ্ড' না কী-একটা ইংরেজি সাময়িক পত্রিকায় মঙ্গলগ্রহের দিকে অভিযানের একটা গল্প ধারাবাহিক বের হচ্ছিল। জগদানন্দ-বাবু সেটা বাংলায় নিজের মতো করে আমাদের বলেছিলেন। মনটা সেই গল্পে এমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত যে আজও তা মনে রয়ে গেছে। সংক্ষেপে গল্পটা এই— প্রকাণ্ড একটা গোলার মধ্যে কয় বন্ধু বহু বছরের খাবার, জল ও অন্যান্য রসদ নিয়ে ঢুকে পড়ল। সেই গোলার ভিতরটা বেশ একটা ঘরের মতো— বিছানা পাতা রয়েছে, মাঝের টেবিলটায় খাওয়া-দাওয়া আর পড়াশুনাও চলবে। দেয়ালের গায়ে সাজানো রয়েছে নানা বিজ্ঞানের বই ও

গ্রহনক্ষত্রের কক্ষপথের ছাপ। মাঝে মাঝে ঘুলঘুলির মতো জানালা। আর কত রকমের যন্ত্রপাতি, ফটোগ্রাফ তোলবার ছোটো বড়ো ক্যামেরা। হিসেব করা হল এত বড়ো গোলাটা ঘণ্টায় কত মাইল করে ছুটে গেলে কত দিন পরে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে পৌছবে। এইখানে আমরা সবাই শিখে নিলাম পৃথিবী থেকে মার্স গ্রহটি কত যোজন মাইল দূরে এবং কত বেগে গোলাটি ছোটা চাই। যা হোক, গোলাটা এখন অতিকায় কামানের মধ্যে ঢুকিয়ে মঙ্গলগ্রহের দিকে লক্ষ্য করে দাগা হল। ছুটে চলল গোলা কত নক্ষত্রমণ্ডলীর পাশ দিয়ে, কত গ্রহ-উপগ্রহের গা ঘেঁষে বিরামবিহীন গতিতে। ঘুলঘুলি জানালা দিয়ে বন্ধুরা উঁকি মেরে দেখে নিত কোন্ কোন্ গ্রহনক্ষত্র তাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝে মাছে সে কী উল্কাপাত— চোখ তাদের ঝলসে যায়। একদিন এক বন্ধু বললেন আর-এক বন্ধুকে, 'ভাই, বইটা ছুঁড়ে দাও তো।' যাকে বলা হল সে বইটি ছুঁড়ে দিল— কিন্তু বই নড়েও না পড়েও না। কী হল? বন্ধুরা বুঝলেন, তাঁরা এমন একটা জায়গায় এসেছেন যেখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ পৌছয় না, আর সেইজন্যেই বই পড়ছে না। তখনি হিসেব হল কত লক্ষ ক্রোশ দূরে গোলাটা চলে এসেছে। আমরা জেনে নিলাম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের দৌড় কতটা। কিন্তু গা শিউরে উঠল ভাবনায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের বাইরে গিয়ে গোলাটা যদি মঙ্গল-গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে না পৌছতে পারে তবে কী হবে? তবে কি গোলা সেই বইটার মতোই ঝুলে থাকবে? বড়োই উৎকণ্ঠায় সেদিনের গল্পে ছেদ পড়ল। পরের সপ্তাহে যখন শুনলাম যে গোলাটা শেষ পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহের টানের মধ্যে এসে যাবে, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। এইভাবে চলতে লাগল গল্পটা। এখন শুনছি সেই গল্পই নাকি সত্যি হবে— কুকুর বাঁদর তো মহাশূন্যে বেশ খানিকটা ঘুরে এল— মানুষও নাকি শিগগিরই যাবে। যাক আর নাই যাক, গল্পের বন্ধুরা কী কী গ্রহনক্ষত্র দেখে দেখে গেল সে কথা শুনে আমরাও জেনে নিলাম তাদের সকলেরই নামধাম ইতিহাস। পরে আমাদের সেই ছেলেবেলায় এক ধূমকেতু বেরোল— নাম তার শুনলাম হেলির কমেট— কী প্রকাণ্ড তার লেজ! সে নাকি পঁচাত্তর বছর পর একবার করে আসে। সেই সময় কোনো একজন কবি সাময়িক পত্রে একটি কবিতা লিখেছিলেন পড়েছি, যার ভাবার্থ এই, 'হে হেলির কমেট, তুমি

এর আগের বার যখন এসেছিলে মা তখন জন্মায় নি মোটে, আর হামাগুড়ি দিত আমার বাবা।' ঠিক এই সময়টার কিছু পূর্বে গুরুদেবের অনুরাগী বন্ধু ত্রিপুরাধিপতি বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্যে একটা মস্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং অনেকগুলি গ্রহনক্ষত্রের চার্ট দিয়েছিলেন। তন্ন তন্ন করে সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা হেলির ধূমকেতু, চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের কোথায় কী আছে— পাহাড়, সমুদ্র— সব দেখে নিতাম। জগদানন্দবাবু আমাদের এ-সব বিষয়ে যে-সব গল্প বলতেন সেগুলিই পরে ছেপে বের হল 'গ্রহনক্ষত্র' নাম নিয়ে। কীটপতঙ্গ-পোকামাকড়ের কত কাহিনী শুনেছি জগদানন্দবাবুর কাছে— কেমন তাদের বাসগৃহের ছাঁদ, কী তারা খায়, কী কাজ তারা করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে গুরুদেব নিজেও গল্প বলতেন। তিনি খুব মনোরম করে গল্প বলতে পারতেন— তাঁর বলার ভঙ্গিতে গল্পের ভাবধারাটি যেন আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত। একটি গল্প এখনো মনে আছে— সেটি গল্পগুচ্ছে 'গুপ্তধন' নামে বেরিয়েছিল। স্পষ্ট মনে আছে লাইব্রেরি-ঘরের মেঝেতে বসে গুরুদেব গল্পটি পড়ে শোনালেন। আমরা সবাই সেদিন মুগ্ধ হয়ে একমনে শুনলাম সেই কাহিনী। একটু একটু গা ছমছম করেছিল। মনে আছে সে রাত্রিতে বহুক্ষণ মানস-চক্ষে জেগে ছিল সেই জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর সুবিশাল মূর্তি, আর মনের গোপন অলিগলিতে গুন গুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই চিরকুটে লেখা রহস্যময় কথাগুলি—

> 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা।
> শেষে দিল রা, পাগোল ছাড়ো পা॥
> তেঁতুল বটের কোলে দক্ষিণে যাও চলে।
> ঈশান কোণে ঈশানী কহে দিলাম নিশানী॥'

কখন যে তার পর ঘুমিয়ে পড়লাম কে জানে।

মাঝে মাঝে অভিনয় হত। খুব ছোটো বয়সে হত মুকুট। একটু বড়ো হলে করতাম আমরা হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকের এক-একটা নকশা। 'রোগের চিকিৎসা', 'চিন্তাশীল', 'অন্ত্যেষ্টিসৎকার', 'বিনিপয়সার ভোজ' ইত্যাদি খুব জমত। সেগুলি যেন পুরোনো হত না। তার পর একাদিক্রমে 'শারদোৎসব', 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'মালিনী' এবং 'রাজা' আমরা অভিনয় করেছিলাম। মাস্টারমশায়রা করেছিলেন 'প্রায়শ্চিত্ত'। অভিনয়ের কথা যেগুলি বিশেষ

তালধ্বজ : শান্তিনিকেতন

তালবন

করে এখনো মনে পড়ে সেগুলি পরে বলব। যতদূর মনে আছে ‘ডাকঘর’ ও ‘ফাল্গুনী’ অভিনয় হয়েছিল আমি চলে আসবার পর। গুরুদেব আমাদের জন্যে এই যে সব নাটক লিখতেন সাহিত্যের দিক থেকে তার মূল্য খুব বেশি এবং স্থান খুব উচ্চে সন্দেহ নেই, মানবজীবনের নিবিড় উপলব্ধিই তাদের উৎস সেও সুনিশ্চিত, তবু এও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, পড়াশুনার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অভিনয়ে ও গানে আনন্দে-উৎসাহে ছেলেদের চিত্তবিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রসার হয় ও সৌন্দর্যবোধশক্তি সতেজ হয়ে ওঠে। ছেলেদের মঙ্গলের জন্যে তিনি কত চিন্তা করতেন তার ইয়ত্তা নেই।

দুপুরের খাবার পরে পালা করে সযত্নে পাতা কুড়িয়ে পরিষ্কার অভুক্ত খাবার গরিব অতিথিদের খাওয়ানোর কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া অভ্যাগত অতিথিদের সেবার কাজেও আমাদের লাগতে হত। পৌষ-উৎসবের সময় এক-এক দল ছেলে এক-এক ঘরের অভ্যাগতদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন পালা করে। অতিথিদের বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, এখানে ওখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া— এই ছিল ছাত্রদের কর্তব্য। এ কাজে আমাদের উৎসাহ ছিল খুব। আগন্তুকেরাও আমাদের সেবায় পরম পরিতোষ লাভ করতেন। এই-যে সেবার ভাব— জীবনগঠনে এর বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেছি।

আমাদের এক-এক ঘরে এক-এক জন ছেলে এক-এক সপ্তাহের জন্যে ক্যাপটেন বা দলপতি নির্বাচিত হতেন। তিনি যেই হোন— পড়াশুনায় সরেস কি মন্দ— তাঁর হুকুম তামিল করতেই হত। তাঁর ক্ষমতা যেমন ছিল তাঁর কর্তব্যও ছিল অল্প নয়। ঠিক সময়ে ছেলেরা ঘুম থেকে উঠলেন কি না, ভালো করে ঘর ঝাঁট পড়ল কি না, বিছানাগুলি পরিষ্কার করে গুটনো হল কি না— এ সবই ছিল তাঁর দায়িত্ব। তার পর সার বেঁধে ছেলেদের নিয়ে যাওয়া খাবার ঘরে কি মন্দিরে— এও ছিল তাঁর কাজ। আর এক কাজ ছিল বুধবারে বুধবারে সাবু যখন আসত— ধোপাবাড়ির কাপড় মিলিয়ে নেওয়া, কাপড় ধুতে দেওয়া। আশ্রমের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করলে কিংবা অন্য ছেলের উপরে কোনো অন্যায় ব্যবহার করলে অভিযুক্ত আসামীকে হাজির হতে হত বিচার-সভায়। সে সভায় বিচারপতি হয়ে বসতেন ঐ ক্যাপটেন। পরে যখন আরো ছেলে বেড়ে গেল এবং আরো ঘর তৈরি হল তখন সকল ঘরের ক্যাপটেনেরা

মিলে এই বিচারসভায় বসতেন। তাঁরা বিচার করে যা রায় দিতেন সেটা গ্রাহ্য করতেই হত। মারধর করে শাসন করবার রীতি একেবারেই ছিল না। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অপমানটাই ছিল মোক্ষম শাস্তি। একবার একটি ছেলে গাছের পাকা পেয়ারা পেড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে একা খেয়েছিল বলে তার একবেলার জলখাবার বন্ধ হয়েছিল। মাস্টারমশায়রা এর মধ্যে আসতেন না বা কোনোরকম মন্তব্য করতেন না। বস্তুত, বিচারসভা এমন উদ্ভট কিছু রায় কখনো দেয় নি যার জন্যে মাস্টারমশায়দের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন হতে পারত। আমাদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন এইরকম করে ভালো ভাবেই চলত।

যতদূর মনে আছে মাস্টারমশায়দের মধ্যেও এক-এক জন এক-এক সময়ে সর্বাধ্যক্ষ হতেন। সেখানেও বড়ো-ছোটো ছিল না। নিজেরাই একজনকে সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচন করতেন। ফলে মাস্টারমশায়দের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। সর্বাধ্যক্ষ-নির্বাচন বেতনের হারের উপর নির্ভর করত না। অধ্যাপক-সভা ছিল — সেখানে মাস্টারমশায়রা বসে ছেলেদের কল্যাণকর বিষয়গুলির আলোচনা করতেন। গুরুদেব অনেক সময় অধ্যাপক-সভায় নানা নূতন প্রস্তাব করে আলোচনা ধরিয়ে দিতেন এবং মাস্টারমশায়দের মতামত জেনে নিতেন।

প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনা হত। মন্দিরে প্রবেশের দরজার উপরকার লোহার খিলানের মাঝখান থেকে একটি বড়ো ঘণ্টা সেকালে ঝুলত। উপাসনার মিনিট-পাঁচেক আগে থাকতে গুরুদেব সেই ঘণ্টাটিকে বাজিয়ে সকলকে উপাসনায় ডাকতেন। দু-একজন নিষ্ঠাবান লোক দূর বোলপুর শহর থেকেও আসতেন এই বুধবারের উপাসনায় যোগ দিতে। আমরা ছেলেরা সার বেঁধে এসে মন্দিরের শুভ্রশীতল শ্বেতপাথরের মেঝের উপর বসতাম জোড়াসন কেটে, যুক্তকরে। তানপুরা ও এসরাজের সঙ্গে গান গেয়ে উপাসনা আরম্ভ হত। ভিন্ন ভিন্ন বুধবারে ভিন্ন ভিন্ন গান হত। কখনো হত পুরানো গান, কখনো হত গুরুদেবের সদ্য-রচিত ব্রহ্মসংগীত। কয়েকটা গান এখনো মনে আছে। প্রায়ই হত—

'জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে।'

অনেক সময় শুনেছি—

'প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
বিহঙ্গমগীতছন্দে তোমার আভাস পাই।'

আরও কত গান সে আর কত বলব। গানের পরে গুরুদেব উপাসনার প্রারম্ভে সুললিত স্বরে মন্ত্র পাঠ করতেন—

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু,
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

ভগবৎ-আরাধনার পর গুরুদেব এক-এক বুধবারে উপনিষদের এক-একটি মন্ত্র ব্যাখ্যা করতেন ও শেষে উপদেশ দিতেন। মন্দিরে গুরুদেব যা বলতেন তার সারমর্ম 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ পর্যায়ে ছাপা হয়ে বের হত। উপদেশের শেষে আবার গান গেয়ে উপাসনা সাঙ্গ হত। পরবর্তী-কালে গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে ক্ষিতিমোহন সেন মশায় মন্দিরে উপাসনা করতেন। কবীর, নানক, দাদূ, মীরাবাঈ এবং আরো কত সাধুসজ্জনের ভক্তবাণী তিনি শোনাতেন এবং কী সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাই তিনি দিতেন! আশ্রমের সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠানে বেদ-উপনিষদের মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করা হত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশুদ্ধ উচ্চারণে ও শ্রুতিমধুর সুরে। সে-সব মন্ত্রের মানে বোঝবার বয়স তখন আমাদের হয় নি— এখনো যে বুঝি পূর্ণভাবে তা বলতে পারি নে। কিন্তু সেই বালক ও কিশোর বয়সে শুনে শুনে যে মন্ত্রগুলি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল জীবনের এই সায়াহ্নবেলায় এখনো তা ভুলি নি। মন্দিরের মধ্যে ফুলের সুবাস, ধূপের পবিত্র গন্ধ, বেদ-উপনিষদের মন্ত্রের বিশুদ্ধ গাম্ভীর্য এবং ব্রহ্মসংগীতের আনন্দহিল্লোলিত ঝংকার একত্র মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব স্বর্গলোক সৃষ্টি করত। আমাদের অপরিণত মনে তা যে আমাদের অন্তরের গভীরে গোপনে নীরবে কাজ করে গেছে, ব্যর্থ হয় নি একটুও— এ কথা আজ জোর করেই বলতে পারি। ঈশ্বর-প্রীতির তাৎপর্য বুঝেছিলাম অস্পষ্ট আভাসে— অলক্ষ্য প্রভাবে সেই অস্পষ্ট পরিচয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আমার জীবন।

ষষ্ঠ অধ্যায় [আম্রকুঞ্জে

অরুণ-আলোর অঞ্জলি নিঃশেষ করে দিয়ে শারদলক্ষ্মী হেমন্তের কুয়াশার অন্তরালে বিলীন হয়ে গেলেন। শিশির-ভেজা তৃণদলের ডগায় ডগায় সকালে-সন্ধ্যায় কে যেন অঞ্জলি ভরে মুক্তো ছিটিয়ে দিতে লাগল। দিনগুলি ক্রমশ ছোটো হয়ে বিকেল হতে-না-হতেই সূর্যদেব পশ্চিমপাটে রক্তিম আভা ছড়িয়ে অস্ত যেতে শুরু করলেন। আমলকীরা শাখা-সার হয়ে এল পাতা ঝরিয়ে, আর শীতের আমেজে আমাদের গা উঠল সির্‌সিরিয়ে। আমার আশ্রমবাসের প্রথম বৎসরের শেষ দিকে হেমন্ত ও শীতের সন্ধিক্ষণে সাতই পৌষের অগ্রদূতেরা আসতে শুরু করলেন একে একে, আশ্রমে যেন একটা জীবনচাঞ্চল্য দেখা দিল। শান্তিনিকেতনের বড়ো দোতলা বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে আশ্রিত পরিজনদের যে-সব ঘরগুলি আছে তাতে লোকসমাগম হতে লাগল। কত-রকম কঞ্চি আর বাঁখারি দিয়ে তৈরি কত রকমের খাঁচা এদিকে ওদিকে রোদে শুকোচ্ছে দেখতে পেতাম। শুনলাম যে বড়ো বড়ো ওস্তাদ বাজিকরেরা সাতই পৌষের মেলার জন্যে কত রকম-বেরকম বাজি তৈরি করছেন। ও অঞ্চলে আমাদের যাতায়াত মাস্টারমশায়রা পছন্দ করতেন না। তাই দূরে থেকে আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি মেরে যতটুকু জানা যায় তাতেই খুশি থাকতে হত। শুনলাম যে সেবার নাকি একটা মস্ত বড়ো মানোয়ারী জাহাজ থেকে

জ্বলন্ত গোলা বর্ষণ হবে পাড়ের বড়ো কেল্লাটার উপর। কে হারে কে জেতে তাই ভাবতে ভাবতে আমরা বিভোর হয়ে যেতাম। আনন্দে উৎসাহে দিন গুণতে লাগলাম।

সাতই পৌষ আশ্রমবাসীদের ভক্তিভরে স্মরণীয় এক পুণ্যদিন। এই দিনে মহর্ষিদেব্ কয়েকজন সমবিশ্বাসী ধর্মবন্ধুগণের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই দিনটিকে গুরুদেব যে কত বড়ো স্মরণীয় দিন মনে করতেন তা তাঁর সাতই পৌষের ভাষণগুলি পাঠ করলেই জানা যায়। আত্মার মুক্তিই হচ্ছে সাতই পৌষের মর্মবাণী। তাই এই পুণ্যদিনে গুরুদেব তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহর্ষিদেবের সাধনার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে প্রকৃতির কোলে ভূমার আলিঙ্গনে ভক্ত-জীবনের মঙ্গলময় প্রভাবে স্বকুমারমতি বালকেরা বেড়ে উঠে মুক্তির আভাস পেয়ে ধন্য হবে। সাতই পৌষের এই মর্মকথাটি আশ্রমবাসী সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

সাতই পৌষের দিন-তিনেক আগে থাকতেই লোকসমাগম শুরু হল। কত দূর গ্রাম থেকে গোরুর গাড়িতে পসরা বোঝাই করে কত দোকানী পসারী আসতে লাগল। কত রকমের হাঁড়ি কলসী— কোনোটা বা লাল, কোনোটা বা কালো। কত দরজা-জানালাই না জড়ো হল। দুটো-তিনটে নাগরদোলা এবং একাধিক চড়কি ঘোড়দৌড়ের মঞ্চ। এক-এক পয়সায় কত পাক খাওয়া যেত সেকালে। গালার কত রকমারি জিনিস— আম আতা কলা শশা টিয়েপাখি হরিণ হাতি ও বাঁদর। তা ছাড়া নানা আকারের কাগজচাপা এবং আরো কতরকম খেলনা ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। বাঁশের ছোটো বড়ো ছড়ি, মুখোশ, তালপাতার টুপি ও হাতপাখা তো থাকতই। হরেকরকম খাবারের দোকান, মিঠাই মণ্ডা ও পাঁপড়ভাজা। বড়ো বড়ো বাক্সের মধ্যে কত রকমের ছবি দেখাত সামনের কাচ-বসানো বড়ো দুটো ফুটো দিয়ে। আর ছবির চেয়ে রসালো হত সেই বাক্সওয়ালার স্বর করে বলা বর্ণনাগুলি। কত বিক্রি হত সাঁওতালি মেয়েদের রূপার গহনা— কানের ঝুমকো, গলার হার, খোঁপার ফুল এবং হাতের বাউটি। আমরা কিছু কিনতাম আমাদের বোনেদের জন্য। কত আসত তাঁতের বোনা কাপড়, বেড-কভার, গামছা। কত-না থাকত মনোহারী দোকান— সামনে ঝুলত একটা করে

প্রকাণ্ড আয়না, দোকানের চেহারা যাতে খোলে। কী বিরাট জনসমাগম। সত্যিই পৌষের মেলা এই অঞ্চলের লোকেদের একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু— সবাই উন্মুখ হয়ে থাকত এই বাৎসরিক মেলার জন্যে। নিজেদের তৈরি শিল্প-দ্রব্য বেচে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে তারা ঘরে ফিরত দু-তিন দিন কাটিয়ে। আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। কবির লড়াই বা যাত্রাগান শুনে শেষ রাত্রে সবাই সেই আসরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। দ্বিপুবাবুমশায় যখন নিজে গিয়ে যাত্রার আসর জাঁকিয়ে বসতেন তখন বহু লোক ঠাকুরবাবুকে দেখে কৃতার্থ হয়ে যেত। সাঁওতাল নরনারীর নৃত্য চলত মৃদঙ্গের তালে তালে রাত-দুপুর পেরিয়ে।

এই কলকোলাহলের মধ্যে মন্দিরে সন্ধ্যার সময় উপাসনা করলেন গুরুদেব নিজে। মন্দিরের সমস্ত ঝাড়গুলিতে মোমবাতি জ্বালানো হল এবং তার আলো কাচের মধ্যে তারার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। বাইরের সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে গুরুদেবের সুললিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল 'যো দেবোঽগ্নৌ' মন্ত্র। তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন বাইরের গোলমাল আমরা শুনতেই পাই নি। একান্তমনে বিহ্বলচিত্তে শুনে নিলাম উপাসনা। আমাদের সেই বালক বয়সে গুরুদেবের উপাসনার সত্য তাৎপর্য বোঝবার শক্তি একেবারেই হয় নি। কিন্তু একটি অনির্বচনীয় আনন্দে যে মনটা ভরপুর হয়ে উঠেছিল সে কথা আজও ভুলি নি।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর ছোটো ছোটো দল বেঁধে এক-একজন মাস্টারমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছেলেরা বাজি দেখতে গেল। তখনকার দিনে বাজি পোড়ানো হত বর্তমান রতনকুঠির উত্তর-পুব দিকে। প্রথমেই সোঁ সোঁ করে উঠল একটা হাউই, বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে দারুণ একটা আওয়াজ করল। সবাই বুঝে নিল এবার বাজি পোড়ানো আরম্ভ হবে। তার পর কত-না তুবড়ি আগুন-ফুলি ফোয়ারা ছোটালো, কত রকমের হাউই উঠতে লাগল কত রকমারি আলো জ্বালিয়ে। কোনোটা ফেটে পড়ল লাল নীল ফুলঝুরি হয়ে, আবার কোনোটা ক্ষান্ত হল একটা মস্ত বোমার আওয়াজ করে। বাজিকরেরা আগুন ধরিয়ে দিতেই সে আগুন চট্‌পট্‌ এদিক-ওদিকের ডালপালাতে ছড়িয়ে গিয়ে জ্বলে উঠল কত বিচিত্র গাছ, যার ডালে ডালে ঝুলে পড়ল রঙবেরঙের আলোর ফুল। বেশ খানিক ক্ষণ চলল এই-সব বাজি। এরকম অদ্ভুত সুন্দর বাজি আমি তো আগে কখনো দেখি নি— মনটা উল্লাসে ভরে উঠেছিল।

শেষে আগুন ধরালো প্রকাণ্ড দুটো কাঠামে। প্রদীপ্ত শিখায় দেখতে দেখতে বেরিয়ে পড়ল একটা মস্ত বড়ো জাহাজ আর কিছু দূরে পর্বতশিখরে একটা দুর্গের চূড়া। তার পর শুরু হল সশব্দে কামান দাগা। গোলাগুলি এদিক থেকে ওদিকে আর ওদিক থেকে এদিকে চলেইছে। কে জেতে কে হারে কে জানে। আস্তে আস্তে নিভে গেল জাহাজের আলোগুলি, দুর্গ থেকে তখনো দুটো-একটা স্ফুলিঙ্গ আসছিল জাহাজটার দিকে। বোঝা গেল জাহাজটাই ঘায়েল হয়ে নিভে গেল। অনেক রাতে প্রাক্‌কুটিরে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়া গেল। সারাদিন ভলাণ্টিয়ারি করে এবং রাত্রে বাজি পোড়ানো দেখে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ল ঘুমে। মেলার মাঠের কল-কোলাহল তখনো চলেছে।

দেখতে দেখতে প্রায় দুই বছর আশ্রমবাস সাঙ্গ হলে আবার গ্রীষ্মের ছুটি এল। তখন পড়ে গেল বাড়ি যাবার তাড়া। কোনো কোনো ছেলের অভিভাবক নিজেই এলেন কিংবা লোক পাঠিয়ে দিলেন ছেলেকে নিয়ে যেতে। যাঁদের নেবার জন্যে বাড়ি থেকে কেউ এলেন না তাঁদের ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে এক-একজন মাস্টারমশায়ের জিম্মা করে দেওয়া হল। কয়েক দল ছেলে যাবেন উত্তরে রামপুরহাটের দিকে, বাকি সকলে যাবেন কলকাতায়— যাঁরা পূর্ববঙ্গের তাঁরা সেখান থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ কুমিল্লা ও ত্রিপুরার উদ্দেশে রওনা হবেন। এবার আর আফতাবুদ্দি মিঞার বয়েল গাড়ি পাওয়া গেল না— কী করে কুলোবে এত ছেলে আর বাক্সপ্যাঁটরা ও বিছানা ঐ ছোটো বাসে। তাই এবারে ব্যবস্থা হয়েছিল কয়েকখানা ছই-ঢাকা গোরুর গাড়ির। আমাদের নানা আকারের টিনের বাক্স এবং বিবিধ রঙের শতরঞ্চি-মোড়া বিছানাগুলি গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে কেউ কেউ গোরুর গাড়িতেই উঠে পড়লেন এবং তার মধ্যে যাঁরা বেশি হুঁশিয়ার ও উৎসাহী তাঁরা গাড়োয়ানদের তোয়াজ করে বলদ হাঁকাতেও লেগে গেলেন। আমরা বেশির ভাগ ছেলে পদব্রজেই রওনা দিলাম। সঙ্গে চলল লাঠিহাতে সেই সর্দার। পিছন আগলিয়ে চললেন মাস্টারমশায়রা। সেই পরিচিত রাঙা মাটির পথ বেয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় সদ্য-শেখা গান গাইতে গাইতে যখন বোলপুর শহরে পৌঁছলাম, দোকানপসারীরা চিনে নিলেন যে ঠাকুরবাবুদের ইস্কুলের দাদা-বাবুরাই বটে— বুঝলেন যে আমরা ছুটিতে বাড়ি চলেছি।

তখনকার দিনে বোলপুর থেকে কলকাতায় অর্থাৎ হাওড়ায় যেতে, স্পষ্ট

মনে আছে, তৃতীয় শ্রেণীর রেলমাশুল লাগত একটাকা সোয়া পাঁচ আনা। মাস্টারমশায় রাজেনবাবু ছুটির সময় কলকাতাযাত্রী ছেলেদের প্রত্যেককে দুটি করে টাকা দিতেন। নেহাত যাঁরা ছোটো তাঁরা ছাড়া অন্য সকলে নিজেরাই টিকিট কিনতাম। বাকি থাকত হাতে যে পৌনে এগারো আনা পয়সা তার কোনো হিসেবনিকেশ দিতে হত না। সেটার সদ্ব্যবহার হত বর্ধমান স্টেশনে। এই সময়ে ছেলেদের প্রকৃতিগত প্রভেদটা বোধ হয় একটু বেরিয়ে পড়ত। কেউ-বা কিনত মিহিদানা ও সীতাভোগ আর কেউ-বা চিংড়িমাছ বা মাংসের প্যাটি। সে সময় বাক্স মাথায় করে 'গরম প্যাটি' ফিরি করে বেড়াত ফিরি-ওয়ালারা। অনির্বচনীয় সুস্বাদু ছিল সেই জলখাবার। এখনো যখনই যাই বর্ধমান স্টেশন দিয়ে, গাড়ি থামলেই মনে পড়ে ছেলেবেলাকার বাড়ি ফেরার কথা। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি বুঝি প্যাটিওয়ালা আসছে। কিন্তু আজকাল আর তাদের দেখি নে, 'গরম প্যাটি' ডাকও শুনি নে— মিহিদানা কি সীতাভোগেও সে রস আর নেই। সেটা যে কেবল মিহিদানা ও সীতাভোগেরই দোষ তা নাও হতে পারে। ঘিয়ের বদলে দালদা চালালে খানিকটা রসবিকার ঘটবেই— তবে অনুমান করি যে তেরোর সঙ্গে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের ব্যবধানটাও তার অন্যতম কারণ হতে পারে।

কলকাতায় ফিরে দিনকতক খুব সমাদরে থাকা গেল। মা মনে করলেন ছেলেটা নিরামিষ খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গেছে। বাবা একটু চাপা স্বভাবের ছিলেন। সহজে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতেন না। কিন্তু একদিন মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি তিনি আমার কণ্ঠার কাছে হাত বুলিয়ে দেখছেন। আমি উসখুস করতেই হাত সরিয়ে নিলেন। ফলে খাওয়া-দাওয়াটা খুব ভালো ভাবেই চলল। এ ছাড়া আমার খাতির ছিল বৌঠান বাসন্তী দেবী এবং বড়দিদি অমলা দাসের কাছে। কী কী নতুন গান 'রবিকাকা' লিখেছেন এবং আমাদের শিখিয়েছেন তার মহড়া দিতে হত প্রত্যহ সন্ধ্যায়। ছুটির দিনগুলি পরমানন্দে কাটতে লাগল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই জ্বরে পড়লাম। সে কী কাঁপুনি দিয়ে ধুম-জ্বর— প্রায় বেহুঁশ হয়ে যেতাম। কয়েকদিন পর জ্বর ছেড়ে যেত। আবার পূর্ণিমায় কি অমাবস্যায় কি একাদশীর দিন জ্বর আসত। এমনি চলল এক মাসের উপর। একবার বাবা নিয়ে গেলেন কর্নেল এন. পি. সিনহার বাড়িতে। তিনি তখন সরকারী কাজে অবসর নিয়ে কলকাতায় ডাক্তারি ব্যাবসা

করছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে রায় দিলেন যে আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। তখনকার দিনের ম্যালেরিয়ার একমাত্র ওষুধ কুইনিন-মিক্সচার চলল সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ও দিকে গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এল। কিন্তু মা বেঁকে বসলেন যে এইরকম দুর্বল শরীরে ছেলেকে কাছ-ছাড়া করা যেতে পারে না। ফলে সে বছর ছুটির পর আমার আর আশ্রমে ফেরা হল না।

কিছুদিন পর শরীরটা যখন চাঙ্গা হল তখন ঠিক হল আমাকে কলকাতার কোনো ইস্কুলেই ভর্তি করা হবে। সে সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মিত্র -প্রতিষ্ঠিত মিত্র ইনষ্টিট্যুশনের খুব নামডাক। ভবানীপুর কাঁসারিপাড়ায় এক ভাড়াটে বাড়িতে সেই ইস্কুলের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুরুতে সেখানে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস ছিল। তার পর যেমন যেমন ছেলেরা বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে পাস হতে লাগল সেইসঙ্গে এক-একটি করে ক্লাসও বাড়তে লাগল। সতীশচন্দ্র বসু মশায় ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং হরিদাস কর মশায় ছিলেন ইস্কুলের পরিদর্শক। বিশ্বেশ্বরবাবু প্রত্যহ একবার করে এসে ক্লাস পরিদর্শন করে যেতেন। আমি ভর্তি হলাম চতুর্থ শ্রেণীতে। তার উপরে তখন আর একটি-মাত্র ক্লাস ছিল। সে ক্লাসে যাঁরা পড়তেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আজকালকার স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী ও দেশনেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বছর-খানেকের একটু উপরে সেই ইস্কুলে পড়েছিলাম এবং সুশীলচন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রমুখ কয়েকটি সতীর্থকে প্রীতিভাজন সুহৃদরূপে পেয়েছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বল্পপরিসর ক্লাসঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতাম। ঠিক বুঝতাম না কারণটা কী। কেবলই মনে পড়ত পল্লবিত আলোছায়াখচিত তরুতলের ক্লাস। শান্তিনিকেতনের নীল আকাশ, খোলা মাঠ এবং সবুজ ধানের ক্ষেতের স্মৃতি মনকে উদাস করে দিত। বাৎসরিক পরীক্ষায় পাস করে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলাম। একদিন সাহসে মন বেঁধে বড়দিদিকে বললাম, 'আমি শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে চাই।' ভয় ছিল বড়দিদি হয়তো রেগেই উঠবেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল যে আমার আগ্রহ দেখে তিনি বেশ খুশিই হলেন। বস্তুত তাঁর খুশি হবারই কথা, কেননা আমার শান্তিনিকেতনে যাবার গোড়াতে ছিল বড়দিদিরই উৎসাহ। তার পর কী হল সঠিক জানতে পাই নি, কিন্তু অল্প কয়দিনের মধ্যেই শুনলাম যে আমাকে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে হবে। বড়দিদি নিশ্চয়ই বাবা-মাকে ও বৌঠানকে বুঝিয়ে রাজি

করিয়েছিলেন আমাকে আশ্রমে ফেরত পাঠাতে। ১৩১৫ সালের পূজার ছুটির শেষেই ফিরে গেলাম ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। আমার বয়স তখন সবে চৌদ্দ।

আশ্রমে ফিরে নানা রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ছাত্রসংখ্যা কিছু বেড়েছে। প্রাক্‌কুটিরে জায়গার সংকুলান হয় না, তারই পুব দেয়ালের গা থেকে টানা লাইনে নূতন ঘর তৈরি হয়ে গেছে। পুবের অংশটার মেঝের কতকটা এক ফুট কি দেড় ফুট উঁচু করে রাখা হয়েছিল। এই নূতন ঘরটিকে বলা হত 'নাট্যঘর'। প্রাক্‌কুটিরের মতো এ ঘরে উত্তর দক্ষিণ দু ধারে টানা বারান্দা ছিল না বলে এই নূতন ঘরখানা বেশ প্রশস্ত হয়েছিল, মাঝখানে একটা চলার পথ রেখেও দুই দেয়াল ঘেঁষে তক্তপোষ পেতে ছেলেদের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভিনয়ের সময় ঘরটিকে খালি করে শতরঞ্জি বিছিয়ে দর্শকদের বসবার জন্যে ঢালা ফরাশ পাতা হত, ঘরের বেদীর মতো অংশটা হত রঙ্গমঞ্চ। কেবল শান-বাঁধানো মেঝেটা ছাড়া এই নাট্যঘরের কোনো চিহ্নই আজকাল আর নেই। আম্রকুঞ্জের গা ঘেঁষে শালবীথি চলে গিয়েছে 'দেহলি'র দিকে, তারই দক্ষিণ দিকে 'বাগান' বলে যে ঘরটি ছিল সেটি আমি ফিরবার আগেই হয়েছিল কি কিছুদিন পরে, ঠিক মনে নেই। সেই ঘরও এখন আর নেই।

ইঁটকাঠের বাহ্যিক পরিবর্তনের থেকেও বেশি অনুভব করেছিলাম চেনা-জানা মানুষের অভাব। প্রথম যখন আশ্রমে আসি তখন যে আমাকে স্টেশন থেকে অভ্যর্থনা করে এনেছিল এবং স্নানের সময় মাঝে মাঝে কুয়ো থেকে সদ্য-তোলা একটিন জল মাথায় ঢেলে দিত সেই জোয়ান পুরুষ কোদোকে দেখলাম না। দ্বিপুবাবুর তখন দুটি বর্মা টাট্টু দিয়ে টানা আপিস-যানের ব্যবস্থা হওয়ায়, না ছিল সেই নধর নিটোল দুটি বয়েল দিয়ে টানা 'সারা ব্যাঙ্ক' আর না ছিল সেই আফতাবুদ্দি মিঞা। আর ছিল না সেই সেকালের ডাকাত-দলের সর্দার, যিনি হয়েছিলেন আমাদের দিনের বৃদ্ধ ডাকহরকরা। ফিরে এসে আর দেখলাম না সেই জাপানী ওস্তাদকে, বানানো হল না নূতন কোনো নৌকা। শুনলাম গ্রীষ্মের ছুটিতে আশ্রম থেকে আমি কলকাতায় ফিরে যখন ম্যালেরিয়ায় পড়েছিলাম তার অব্যবহিত পরে সর্বাধ্যক্ষ মোহিতবাবুর দেহান্ত হয়। আমার আশ্রমে ফেরার কদিন আগেই গুরুদেবের মেজো জামাই সত্যবাবুও দেহত্যাগ করেন। সবচেয়ে মনটা দমে গেল যখন দেখতে পেলাম না বালককালের

সতীর্থ শমীকে। যে গ্রীষ্মকালে আমি আশ্রম থেকে যাই তারই পরের পুজোর ছুটিতে শমী গিয়েছিলেন সন্তোষদার ভাই ভোলার সঙ্গে মুঙ্গেরে। সেইখানে হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে শমী চলে গেলেন পরমপিতার শান্তিময় ক্রোড়ে— আর ফিরলেন না শান্তিনিকেতন আশ্রমে। তাঁর অভাবে আশ্রম যে কতখানি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল তা বুঝেছিলেন আশ্রমবাসী সকলেই এবং বিশেষ করে অনুভব করেছিলাম তাঁর সহপাঠী আমরা ক'জনা। ফুলের মতো সুন্দর ছিল তাঁর চেহারা, তেমনি স্নিগ্ধ সুকোমল ছিল তাঁর স্বভাব। মনের মধ্যে এখনো ফুটে রয়েছে সেই উজ্জ্বল মুখচ্ছবি। কিন্তু গুরুদেব এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মবশ ছিলেন, ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভর এমনি গভীর ও অটল ছিল যে, শমীর মৃত্যুশোকেও তাঁকে বিচলিত হতে দেখি নি। মা-মরা ছোটো ছেলেটির 'পরে তাঁর যে স্নেহমমতা ছিল সে বোধ করি ছড়িয়ে পড়েছিল আশ্রমের সকল শিশুতে।

আশ্রমে ফিরে দেখলাম অনেক নূতন অধ্যাপক এসে গিয়েছেন। কাশী থেকে এম. এ. পাস করে শাস্ত্রী উপাধি পাবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন আসেন আশ্রমে ১৯০৮ সালের আষাঢ় মাসে। গায়ের রঙ ছিল মোটামুটি গৌরবর্ণ, লম্বায় বাঙালী ভদ্রলোক হিসাবে বেশ একটু দীর্ঘকায় ছিলেন, প্রস্থেও কম ছিলেন এমন নয়। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত মুচকি হাসি। তখন দেশবিদেশ পর্যটন করে বহু ভক্তবাণী, ভজন, বাউলের গান ও পাড়াগেঁয়ে ছড়া সংগ্রহ করে তিনি ভরেছিলেন তাঁর বিদ্যার ভাণ্ডারে। গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে ক্ষিতিবাবু মন্দিরে উপাসনা করবার সময় এই-সব ভক্তবাণী আমাদের শোনাতেন এবং সহজ করে বোঝাতেন। তাঁর কাছে কিছুদিন ইতিহাস পড়েছিলাম। ইতিহাস তিনি পড়াতেন খুব সরস গল্পের মতো করে। বাজীরাওকে জিলিপি খেতে দেখে কে নাকি বলেছিল, 'দেখো দেখো, জিলিপি জিলিপি খাচ্ছে'— সে কথা এখনো মনে আছে, এবং বাজীরাও যে বেশ একজন প্যাঁচালো ডিপ্লোম্যাট ছিলেন তা বিশেষ করে বুঝে নিয়েছিলাম এই উপমাটুকু থেকে। ক্ষিতিবাবুর হাস্যপরিহাস ছোটো-বড়ো সবাইকে নিয়েই হত। সর্বদা সাবধানে থাকতাম পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলি কি করে ফেলি তাঁর সামনে —কেননা, ভুল করলে তক্ষুনি একটা পরিহাসের তীক্ষ্ণ বাণ বুকে এসে লাগবার নিত্য সম্ভাবনা ছিল। সম্প্রতি দাড়িগোঁফে মাস্টারমশায়ের হাসিটি অল্প-বিস্তর চাপা পড়লেও বচনগুলি পূর্বের মতো সতেজ ও সরসই আছে। বহুদিন

পরে আশ্রমে দেখা, তখন আমি কলকাতা হাইকোর্টের জজ; চাপরাশি নিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা কখনোই বিশেষ রপ্ত হয় নি। মাস্টারমশায় বললেন, 'কৈ রে সুধীরঞ্জন, তোর চাপরাশি তো দেখছি না— কী জজিয়তি করিস! লোকে মানবে কেন?' বললাম, 'মশায়, ওটা আমার তেমন সুবিধা হয় না।' তিনি বললেন, 'বলিস কী— চাপরাশি, তার মানে হল চাপের রাশি, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে concentrated pressure— চাপরাশি না থাকলে জজ কিসের রে?'— বলে মুচকি হাসতে লাগলেন। শান্তিনিকেতনের মাঠে বাটে এমনি ঘুরে বেড়াই দেখে চেনা অন্য কোনো জজের সঙ্গে তফাতটা তাঁর নজরে পড়েছিল বোধ হয়, তাই এই পরিহাস— তাঁকেই লক্ষ্য করে, আমি উপলক্ষ্য।

আর মনে পড়ে কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে। শুনেছিলাম তখন যে তাঁর 'পরে পুলিসের খুব সুনজর ছিল না বলেই গুরুদেব তাঁকে শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন। তিনি অতি অমায়িক ও পরদুঃখকাতর মানুষ ছিলেন। পাতলা দোহারা চেহারা, রঙ বাঙালীর পক্ষে ফরসাই বলা যেতে পারে। যে-কোনো সৎকার্যে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিছুদিন আশ্রমে থাকবার পর তিনি বিলেতে পড়তে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে পরে লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেবের সঙ্গে সুরুলের চারি দিকে পল্লীউন্নয়ন-কার্যে লেগে গেলেন।

পরে পরে আরও যে-কজন মাস্টারমশায় এসেছিলেন আমার সময়ে, তাঁদের কথা এইখানেই বলে রাখি। তাঁরা কে কবে এসেছিলেন সঠিক মনে নেই। শরৎকুমার রায় মশায়কে বেশ মনে পড়ে। দৈর্ঘ্যে বেঁটে বললেই চলে। রঙটি নিকষ-কালো— মনটি হাসিখুশিতে ভরা। মাস্টারমশায়দের মধ্যে চায়ের মজলিশে তিনি জমিয়ে বসতেন। চা পরিবেশনের ভার ছিল তাঁর উপরেই। 'শরৎদা' বললেই মাস্টারমশায়রা তাঁদের নিজ নিজ বরাদ্দ পেতেন। ভাবী 'চা-চক্রে'র চারাগাছ এইভাবেই প্রথম রোপণ করা হল অনুমান করি। আমরা ছেলেরা বৃষ্টিতে ভিজে, গায়ের কাপড় গায়ে শুকিয়ে আশ্রমে ফিরলে শরৎবাবুর ব্যবস্থা ছিল আদা-চা খেতেই হবে। তখন কিন্তু ঐ আদার রস দেওয়া চা অমৃতসমান মনে হত। শরৎবাবু আমাদের শিখ ও মারাঠি ইতিহাসের গল্প শোনাতেন— সেই গল্পগুলিই পরে পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল।

আমি ফেরবার কিছু পরেই শুনলাম যে আমাদের ইংরেজি পড়াবার জন্যে ভালো একজন মাস্টারমশায় আসবেন— ইংরেজিতে তাঁর নাকি বেজায় দখল, পুরো বাইবেলটা নাকি তাঁর মুখস্থ। এইরকম ডঙ্কা বাজবার পর এলেন চুনিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বেশ বলিষ্ঠ শরীর এবং ভারিক্কি তাঁর চাল ছিল। ইংরেজি উচ্চারণ সত্যিই ইংরেজদের মতন এবং ইংরেজি সাহিত্যে যথার্থ দখল ছিল। মেজাজটা একটু রুক্ষ এবং রসবোধের গতি ছিল ধীর মন্থর। শরৎবাবুর চায়ের মজলিশে কোনো রসিকতার কথায় অন্যান্য মাস্টার-মশায়দের হাসি হয়ে চুকে যাবার খানিকটা পর চুনিবাবু হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠতেন। এই হাসিটি বিগত কোন্ সময়ের কোন্ রসিকতাপ্রসূত বুঝতে না পেরে অন্য সকলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে তিনি হাসতে হাসতে নিজেই তা সবিশেষ ব্যাখ্যা করে দিতেন।

সত্যেশ্বরবাবু ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ, এ দিকে পরমরসিক। তাঁর ভাই ছিলেন বীরেশ্বরবাবু, আমরা তাঁকে ডাকতাম বীরেশ্বরদা। তিনি এলেন রাজেনবাবুর জায়গায়। প্রতি বুধবারে কাগজ পেনসিল ও বাড়িতে চিঠি লেখার পোস্টকার্ড সরবরাহ করতেন আমাদের। হীরালালবাবুর উপর পুলিসের বিশেষ বক্রদৃষ্টি ছিল। বিশালকায় মানুষ ছিলেন, পালোয়ান বললেই হয়। কী প্রচণ্ড দেখাত তাঁর মাংসপেশীগুলো, যখন বাহুদুটি ভাঁজ করতেন হাত মুঠো করে— বুকের ছাতিই বা কী প্রশস্ত! এরকম চেহারার লোকের উপর সেই স্বদেশী আমলে পুলিসের নজর না পড়ে যায় না। কালীমোহনবাবুর মতো তাঁকেও গুরুদেব এনেছিলেন শান্তিনিকেতনে পুলিসের জুলুম থেকে রেহাই দেবার আশায়।

তেজেশদা এসেছিলেন পড়তে, না পড়াতে, আজ পর্যন্ত তার হদিস পাই নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি অনেকদিন ছোটোদের পড়িয়েছিলেন, আজও পড়াচ্ছেন। মন্দিরের উত্তর-পূর্বে 'তালধ্বজ' তাঁর শান্তিনীড়— পরবর্তীকালে গুরুদেব কবিতা লিখে এটিকে সাহিত্যে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তালগাছের একানড়ের মতো ছেলেদের মনে ভীতি সঞ্চার করেন না, বরং তার বিপরীত— মাঝে মাঝে তাঁর প্রিয় এসরাজটি বাজিয়ে তিনি শিশুদের মনোরঞ্জনই করে থাকেন। সকলেরই তেজুদা, সকলেরই বন্ধু, অমায়িক মানুষ তিনি। বরানগরের যতীন মুখুজ্জে মশায়কেও বেশ মনে আছে।

তাঁর নামেই তাঁর ভাই ধীমু প্রখ্যাত, না ধীমুর নামেই তাঁর পরিচয়, নিশ্চিত বলতে পারি নে। হাসপাতালে ছেলেদের সেবা-শুশ্রূষা করতে এসেছিলেন অক্ষয়বাবু। তিনিও স্বদেশী যুগের কর্মী— বিপিন পাল মশায়ের সঙ্গে ছিলেন অনেক দিন। মাতৃসম স্নেহশীল ছিল তাঁর ব্যবহার অসুস্থ ছোটো ছেলেদের প্রতি। বিনোদবিহারী রায় কলকাতা মেডিকেল কলেজের ভালো ছাত্র ছিলেন, আগাগোড়া তাঁর পরীক্ষার ফল ভালো ছিল। শেষ বছর পর্যন্ত এম. বি. পড়ে তিনি শেষ পরীক্ষাটা দেন নি। পরীক্ষা পাস করে ডাক্তার হলে পাছে টাকা রোজগারের লোভ হয়, শুনেছি তাই তিনি শেষ পরীক্ষাটা দেন নি, লোকসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আশ্রমের হাসপাতালে কিছুকাল ডাক্তারি করে পরে তিনি আসামের চেরাপুঞ্জিতে একটি ব্রাহ্মমিশন প্রতিষ্ঠা করে আজীবন জনহিতকর কাজ করে গেছেন।

১৯১০ সালের জুন মাসে এলেন নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়। বোধ করি তখন তাঁর মাঝবয়স পেরিয়ে গেছে। চেহারা ছিল সুদর্শন, মোলায়েম কণ্ঠস্বর, কথাও বলতেন খুব মিষ্টি করে। ব্যবহারে শান্ত ও অমায়িক কিন্তু চরিত্রবলে দৃঢ় অটল— এরকম মানুষ খুব কমই মেলে। মাস্টারমশায়ের মতো এমন ভোলা-মন লোকই দেখি নি। অন্তত একবার ট্রেন ফেল না করে তিনি বোধ হয় জীবনে কখনো ট্রেন ধরতে পারেন নি। আশ্রম থেকে বোলপুর স্টেশনে যাবার পথে যে কটি চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে তাদের প্রত্যেকের সপরিজন-কুশলসংবাদ খুঁটিয়ে নেওয়া চাই— সেটা যে সময়সাপেক্ষ তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ততক্ষণ সরকারী রেলগাড়ি তো স্টেশনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে না— কাজেই মাস্টারমশায়ের প্রায়ই ট্রেন ফেল হত। বহুবিধ জ্ঞানের তিনি ভাণ্ডারী ছিলেন কিন্তু জ্ঞানের অভিমান তাঁর ছিল না একেবারেই। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সান্ধ্যসভায় তাঁর প্রায়ই ছিল আমন্ত্রণ। সত্যি আমাদের তিনি পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করে গেছেন। আশ্রমবাসের শেষ বছরটা তাঁর কাছে ইংরেজি পড়েছিলাম।

দ্বিপুবাবুর স্ত্রী হেমলতা দেবী থাকতেন নিচুবাংলায়। গুরুদেবের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের দেখাশুনা করতেন। ছেলেদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। আমরা সকলেই তাঁকে 'বড়োমা' বলে ডাকতাম। কে যে কবে প্রথমে তাঁকে 'বড়োমা' বলে ডাকলেন সে কথা আশ্রমের ইতিহাসের পাতায় লেখা
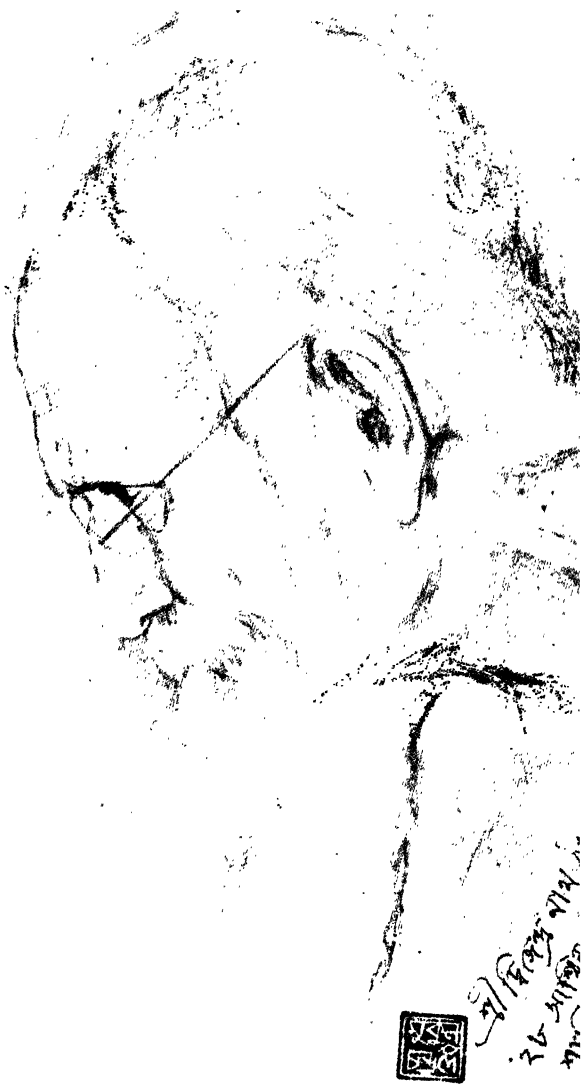
বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ

নেই। কিন্তু এই পঞ্চাশোর্ধ্ব বৎসর ধরে আমরা তাঁকে 'বড়োমা' বলেই ডেকে এসেছি। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নিচুবাংলায় গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আনা যেত পরমান্ন ও পিঠে খেয়ে। নিচুবাংলায় গেলেই উঁকিঝুঁকি মারতাম দ্বিজেন্দ্র-নাথের ঘরের দিকে। বেশির ভাগ সময়েই দেখতাম তিনি পড়ছেন কি লিখছেন। মাঝে মাঝে দেখেছি কাগজ দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাক্স বানাচ্ছেন। সে বাক্স নাকি অনেক অঙ্ক কষে মাপ ঠিক করে করতে হত। শুনেছি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও রচনার মধ্যে মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড কী করে লেখা যায় তারও চর্চা করতেন। তাঁর ঘরে কাঠবিড়ালী শালিখ প্রভৃতির খুব আনা-গোনা ছিল। শুনেছি তাঁর খাবার সময় তারা নাকি তাঁর ঘাড়ে কি টেবিলে বসে যেত খাবার জন্যে। এগুলিও ছিল নিচুবাংলার আকর্ষণ। মুখ্য আকর্ষণ অবশ্য ছিল বড়োমার ঘরের দাওয়ায় বসে খাওয়া। বড়োমা এখন পুরীতে এক বিধবাশ্রম স্থাপন করেছেন। সেখানে দুঃস্থ বিধবাদের কিছু কিছু লেখাপড়া, সেলাইয়ের কাজ এবং তাঁতের কাপড়-গামছাও বোনা শেখানো হয়। একবার সস্ত্রীক সেখানে গিয়ে আশ্রমটি দেখে বড়োমাকে প্রণাম করে এসেছি। খুব বড়ো কাজ তিনি করছেন নীরবে ও অকাতরে। তিনি এখন আরও বেশিসংখ্যক ছেলেমেয়েদের বড়োমা হয়ে আছেন। কিন্তু বিশ্বাস করি, শান্তিনিকেতনের ছেলে, তাঁরা বুড়োই হোন আর ছেলেমানুষই হোন— যখন 'বড়োমা' বলে ডেকে দাঁড়ান তখন নিশ্চয়ই একটু বিশেষ রকমে সাড়া পান। তাঁর কাছ থেকে আমরা যে স্নেহ পেয়েছি তা ভোলবার নয়।

পূর্বে বলেছি আশ্রমে ফিরে এসে দেখি ছাত্রসংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে। আমি এবার তৃতীয় শ্রেণীতে বছরের মাঝামাঝি ভর্তি হলাম। ক্লাসে তখন আমরা জন-দশেক ছেলে। এক ভোলা ছাড়া আমাদের ক্লাসের সবাই নবাগত, অর্থাৎ গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি কলকাতা চলে যাবার পর আগত। ত্রিপুরার মহিম ঠাকুর (দেববর্মণ) মহাশয়ের ছেলে সোমেন্দ্রর মতো ছেলে কমই দেখা যায়। চেহারাটা ছিল তাঁর যেমন নধর নরম, স্বভাবটিও ছিল তেমনি নম্র মধুর। পরকে আপন করে নেবার এবং ভালোবাসবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। সোমেন্দ্রর গানের গলা তেমন ছিল না, কিন্তু গাইবার উৎসাহ ছিল অদম্য। মনে আছে একবার একটি ভদ্রমহিলা তাঁকে জিজ্ঞাসা

শমীন্দ্রনাথ

করেছিলেন— 'আপনি তো শান্তিনিকেতনের ছেলে, আপনি রবীন্দ্রনাথের গান করেন না?' তার জবাবে অম্লানবদনে সোমেন্দ্র বলে ফেললেন, 'তা গুরুদেবের প্রায় সব গানই মোটামুটি গাইতে পারি বৈকি।' দাবির বহর দেখেই মহিলাটি বোধ হয় আমার বন্ধুটির কেরামতি বুঝেছিলেন, তাই গানের কথা ঐখানেই শেষ করেছিলেন। ভাগ্যিস গানের পরীক্ষাটা হয় নি। শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সোমেন্দ্র আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফেরার পর ত্রিপুরা-দরবারে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েছিলেন। কলকাতায় আমাদের বাড়ি খুবই আসতেন, আমার মাকে 'মাসিমা' বলে ডাকতেন। মা তাঁকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন, তিনি এলে ঘরে যা-ই থাক্ খাইয়ে দিতেন। শান্তিনিকেতনের বড়োমাও সোমেন্দ্রকে খুব স্নেহ করতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সোমেন্দ্র ত্রিপুরাধিপতির কাছ থেকে বেশ মোটা রকমের একটি দান সংগ্রহ করে গুরুদেবকে দেন আশ্রমের কাজে। চেকখানা দিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে সোমেন্দ্র কলকাতায় আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মা তাঁকে খেয়ে যেতে বলায় সোমেন্দ্র বলেছিলেন, 'মাসিমা, আজকে আর খাব না। লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি বউকে আনতে, ফিরে এসে দুজনেই খেয়ে ও থেকে যাব দু দিন।' সোমেন্দ্র সেই রাত্তিরেই রওনা হয়ে গেলেন লক্ষ্ণৌ-অভিমুখে। সে যাত্রা যে অগস্ত্যযাত্রা হবে কে তা জানত। যাবার পথে ভীষণ রেল-দুর্ঘটনায় সোমেন্দ্র মারা গেলেন। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর একমাত্র নিশানি পাওয়া গিয়েছিল ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্কের আধপোড়া চেকবইখানা। শেষ গুরুদক্ষিণা দিয়ে সোমেন্দ্র চলে গেলেন, বন্ধুপ্রীতির স্মৃতিটুকু মাত্র রেখে।

মনোরঞ্জনদার বয়স ছিল আমার চেয়ে কয়েক বছর বেশি। গৌরবর্ণ সৌম্য মূর্তি ছিল তাঁর। সাহিত্যে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ, সুন্দর বাংলা কবিতা তিনি লিখতেন। মনে আছে তখনকার দিনের চার আনা দামের একখানা বাঁধানো খাতায় তাঁর লেখা অনেকগুলি কবিতা স্বহস্তে নকল করে বইখানা আমার নামে উৎসর্গ করে আমারই হাতে তিনি সমর্পণ করেছিলেন। আমার খুব আদরের জিনিস ছিল সেই কবিতাগ্রন্থ। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য আমার যে, কোনো-এক সময়ে বাড়ি বদলাবার গোলমালে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সতীর্থের সে অমূল্য উপহারটিও হারিয়ে ফেললাম। মনোরঞ্জনদার

ছু-চারটে লেখা আশ্রমের সাময়িক পত্রিকা 'শান্তি'তে এবং পরে কলকাতা ও ঢাকার অন্যান্য পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল।

বিশুদাকে (বিশ্বেশ্বর বসু) সুপুরুষ বলা চলত না অত্যুক্তি করেও। তবে চেহারাটা যতটা না রুক্ষ ছিল, মুখের ভাবটি করে থাকতেন তার চেয়ে ঢের বেশি রুক্ষ। কাব্যে তাঁর পরম অশ্রদ্ধার ভান ছিল। ইংরেজি কি বাংলা কোনো ভালো কবিতা বিশুদার কাছে আওড়ালেই বিশুদা বলতেন, 'আমি কাব্যকাননের কাঠঠোকরা— আমায় আর কেন ?' কথাটা আমাকেই ঠেস দিয়ে বলা। ব্যাপারটা খুলেই বলি তবে। শরৎবাবু একবার আমাকে বলে ফেলেছিলেন 'আশ্রম-কোকিল'। আমি নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম যে আমার সুকণ্ঠের তারিফ করেই মাস্টারমশায় ঐ নামটি আমায় দিয়েছেন— মনে বেশ স্ফূর্তি অনুভব করেছিলাম। বিশুদা বললেন, 'মাস্টারমশায় যে নামটা দিয়েছেন সেটি দ্ব্যর্থক হতেও পারে।' কথার ধাঁচে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল, বিশুদা আমার গায়ের রঙের প্রতি কটাক্ষ করেই কথাটা বললেন। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে মাস্টারমশায়ের গায়ের রঙ আমার চেয়েও নিদেনপক্ষে দুই পোঁছ গাঢ়তর ছিল, সুতরাং রঙ নিয়ে তিনি আমাকে উপহাস করেছেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রথমে তবু মনটা কেমন দমে গেল। আমার কোকিল বলে খ্যাতি ছিল বলেই বিশুদা নিজেকে কাঠঠোকরা বলে পরিতোষ লাভ করলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন নানা নূতন ছন্দে কবিতা লিখছিলেন। তাঁর 'তীর্থরেণু'তে একটি অভিনব ছন্দের কবিতা ছিল। সেটির প্রথম স্তবক ছিল চার অক্ষরের ছত্রে ছত্রে গাঁথা : স্তবকে স্তবকে ছত্রের মাত্রাসংখ্যা বেড়ে বেড়ে বেশ দীর্ঘায়ত হয়ে আবার কমতে কমতে শেষ স্তবকে চার অক্ষরের ছত্র গেঁথে সমাপ্ত হল। পেটমোটা, আগেপিছে ক্রমশ টিকটিকির লেজের মতো। মনোরঞ্জনদা যখন ছন্দটার তারিফ করছিলেন বিশুদা উঁকি মেরে কবিতার চেহারাটি দেখে হাই তুলে বললেন— 'সংক্ষেপে বলতে গেলে এটি হল বেজি ছন্দ।' বিশুদার একটা পোষা বেজি ছিল— বেশ বোঝা গেল যে ছন্দের আকৃতি দেখেই তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল সেই পোষ্যটির ছুঁচলো মুখ ও লম্বা সরু লেজটি। বিশুদা আমাদের সঙ্গে পাস করে বেরিয়ে শেষে কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে স্বস্থান ভাগলপুরেই ডাক্তারি করতেন। বিশুদার মেজো ভাই বীরেনও এসে জুটলেন আমাদের ক্লাসে—

ক্ষিতিবাবু তাঁর নামকরণ করলেন 'শিশু'। পরে যখন তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি এলেন আশ্রমে তখন তাকে 'যীশু' বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। বীরেন পরে অ্যাটর্নি হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বেশ পশার জমিয়েছেন, ইতিহাসচর্চাও করেন। মাস্টারমশায় জগদানন্দবাবুর ছেলে সাহিত্যসমাজে এক সময়ে ত্রিগুণানন্দ নামে খ্যাত হয়েছিলেন, সতীর্থ আমরা তাঁকে 'পটলদা' বলেই ডাকতাম। পটলদা ভালো বাংলা লিখতেন। গদ্যে লিখতেন বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ আর ছন্দে বেশ একটু ভারিক্কি ভাবের কবিতা। তাঁর অনেক লেখা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে অসুস্থতাবশত পটলদা সাহিত্যে ও জীবনে বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি, অকালেই দেহত্যাগ করেন। সত্যেন ভট্টাচার্য ছিলেন উপেনদার মেজো ভাই— দেখতে ফরসা, মাথায় খুব পাতলা চুল। পরে যখন কলকাতায় কলেজে পড়তেন, তখন ছাত্রাবাসে যে নাপিত ক্ষৌরকার্য করতে আসত তার সঙ্গে নাকি সত্যেন অর্ধেক দামে চুল ছাঁটাবার বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন, এইরকম কিংবদন্তী শুনেছি। মোটের উপর খেলাধুলা পড়াশুনো দুই-ই ভালো করতেন। তাঁদের যমজ ছোটো ভাই ছিলেন জিতেন্দ্র, ও ব্রজেন্দ্র— লব কুশ নামে পরিচিত। ব্রজেন্দ্র শ্রীরামপুরের উইভিং কলেজের সর্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। শ্যামদা ছিলেন শাস্ত্রীমশায়ের আত্মীয় এবং হীরালালদা ছিলেন ক্লাসের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ— দুজনেই খেলার মাঠে নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। জ্ঞানবাবুর ছোটো ভাই সুধীন চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গেই পড়তেন। পরে তিনি বেঙ্গল ভেটারেনারি কলেজ থেকে পশু-চিকিৎসার ডাক্তারি পাস করেছিলেন। ভুল জায়গায় বেফাঁস কথা বলে ফেলবার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল আমাদের সোমেন্দ্রর। সুধীন ডাক্তারি পাস করবার পর ক্ষিতিবাবুর সামনেই সোমেন্দ্র বলে বসলেন, 'যাক, আমাদের একজন ডাক্তার হল।' আর যাবে কোথায়— তীরের মতো জবাব এল ক্ষিতিবাবুর— 'হ্যাঁ, তোমাদের চিকিৎসাটা ভালো রকমেই হবে।' বড়োমাও আমাদের সঙ্গে ইংরেজি ক্লাসে যোগ দিতেন। অজিতবাবুর স্ত্রী লাবণ্যদিও বোধ করি কিছুদিন এসেছিলেন ক্লাসে। যতদূর মনে পড়ে গুরুদেবের ছোটো মেয়ে মীরাদিও আসতেন। হিরণদি বলে একজন ছিলেন আমাদের নিত্যকার সহপাঠিনী।

আমি যখন আশ্রমে ফিরে এসে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলাম তখন উপরে আরো দুটো ক্লাস ছিল। সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে পড়তেন উপেনদা ও অরুণদা, আর আমাদের ঠিক উপরের ক্লাসে ছিলেন গৌরদা ও দেবলদা, তাঁদের কথা আগেই বলেছি। ফিরে এসে দেখি অরুণদা আগেরই মতো লিকলিকে রয়ে গেছেন কিন্তু গৌরদার চেহারা হয়ে উঠেছে আরো বলিষ্ঠ; এক মারে ফুটবল বড়ো মাঠের মাঝ-বরাবর পৌঁছে দিতে পারতেন। তাঁর সুগঠিত দেহ সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতো দেখাত। দেবলদার ছেলেমানুষি ছিল একই রকম। বয়েস পনেরোর কাছে পৌঁছলেও কাঠের নৌকোতে পাল তুলে তখনো মাঝে মাঝে জলে ভাসাতেন, তবে সেটা সামনের ছোট্ট ডোবাটিতে নয়, দূরে ভুবনডাঙার তালদিঘিতে। অনেক নূতন ছেলে আমার ফেরবার আগে এবং তার পর ধীরে ধীরে ক্রমাগত এসেছেন; এঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁদের সঙ্গে দেখাশোনা হত তাঁদেরই বিশেষ করে মনে পড়ে। ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এসেছিলেন তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন ও ধীরেন। বীরেন ছিলেন খেলোয়াড়। গৌরদা যখন কলকাতায় কলেজে পড়তে গিয়ে মোহনবাগানে ঢুকে পড়লেন বীরেন তখন শান্তিনিকেতনে গৌরদার সিংহাসনটি দখল করে বসলেন। পরে তিনি বি. এম. সেন নামে খ্যাত হয়ে কনট্রাক্টার ও ইঞ্জিনিয়ার রূপে প্রচুর পশার-প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। বীরেনের মধুর স্বভাবে শিক্ষক এবং সতীর্থেরা সকলেই আকৃষ্ট ছিলেন। বীরেন বেশ হাসিখুশি ও রসিক প্রকৃতির ছেলে ছিলেন, সেই স্বভাব এখনো আছে। বীরভূমের ভাষাটি তাঁর তখন থেকেই সরগর হয়েছে এবং সেই ভাষায় রসাত্মক গল্প বলায় তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা এখনো রয়েছে। ছেলেমহলে তার চিরকালই প্রতিপত্তি— তাঁর জীপে চড়ে নি এমন ছেলে আশ্রমে দুর্লভ। ধীরেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। মনে মুখে এক— কালোকে কালো বলতে মুখে আদৌ বাধে নি কোনোদিন। লণ্ডন থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি পেয়ে বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ-পদে কয়েক বছর কাজ করবার পর এখন তিনি পশ্চিম-বাংলা সরকারের শিক্ষাসচিব হয়ে যশস্বী হয়েছেন। দুই ভাই মিলে শান্তি-নিকেতনেই বসতি করেছেন— প্রাচীনকালের বন্ধুজনেরা তাঁদের মায়ের স্নেহ-সমাদর এখনো পেয়ে থাকেন। এই দুটি ভাইয়ের স্ত্রী দুটিরও তুলনা নেই অতিথিসেবায়, তার সত্য সাক্ষ্য দিতে পারি নিজের জ্ঞানমতে।

সে সময় আর এসেছিলেন ক্ষিতিবাবুর শ্যালক প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত, যাঁকে আমরা পিলু বলেই জানি। পরে পিলু বিহারের সমবায় সমিতির চীফ অডিটার হয়েছিলেন এবং এখন অবসর নিয়ে পাটনাতে বসতি করে সেখানকার আশ্রমিক-সংঘের সভাপতিত্ব করছেন। পিলুর ছোটো ভাই সেবক, যিনি এখন আশ্রমের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার রূপে কাজ করছেন, তিনি বোধ হয় কিছুকাল পরেই এসেছিলেন। ক্ষিতিবাবুর পরামর্শেই বোধ করি স্বরকুমার সেনকে তাঁর বাবা মা পাঠিয়েছিলেন আশ্রমে। ডানপিটে দুরন্ত ছেলে, তেমনি জোয়ান চেহারা, ভয়ডর তাঁর ছিল না। লঙ জাম্প, হাই জাম্প, গাছে চড়ে লাফ, সবেতেই তিনি ছিলেন ওস্তাদ। বর্ষার দিনে কোপাই নদীতে বান ডাকলে তার উজানে সাঁতার দিতে হবে এই ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। মাস্টারমশায়দের অনুমতি পেলে লাইব্রেরি-বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তেও বোধ হয় তাঁর মজা লাগত। খেলাধুলায় বীরেন সেনের ছিলেন সাকরেদ, কিন্তু পড়াশুনায় উঠেছিলেন তাঁর সেই গুরুটিকেও ছাড়িয়ে। আর কী অপূর্ব মিষ্টি ছিল তাঁর গানের গলা। একদল ছেলের মধ্যে স্বরকুমারকে আগে চোখে পড়তই। অল্পবয়সে তিনি বিলেতে অধ্যয়ন করতে যান। এখন তিনি শুনেছি খনি খুঁড়ছেন মধ্যপ্রদেশে। সে সময়ে এসেছিলেন সুহৃদ ও তাঁর ভাই প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত। সুহৃদ ছিলেন আমার সমবয়সী, যদিও আমার এক ক্লাস নীচে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ্য হয়েছিল। গান শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এমন নম্র মধুর স্বভাবের ছেলে কমই দেখা যায়। প্রদ্যোতকে আমরা হাবলু বলেই জানি। মন্দিরে গুরুদেবের উপাসনা এবং উপদেশ তিনি লিখে নিয়ে গুরুদেবকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিতেন। হাবলুর অনুলিখিত গুরুদেবের অনেক ভাষণ 'শান্তিনিকেতন' পত্রে ছাপা হয়েছিল, গুরুদেব-কৃত 'বলাকা'র ব্যাখ্যান তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাবলু বরাবরই আশ্রমটিকে হৃদয়মন দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। কর্মক্ষেত্রেও তিনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। আয়কর-কমিশনারের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে এখন তিনি বিশ্বভারতীর সেবায় ও পক্ষিতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

এখন তপনমোহনের কথা উল্লেখ করি। তিনি নয়নদার ছোটো ভাই। সম্পর্কে তিনি গুরুদেবের নাতি, তাঁর মা গুরুদেবের বড়দাদার কন্যা, তার

উপর তিনি বড়োমার ভ্রাতুষ্পুত্র। এই-সবে মিলিয়ে আশ্রমে তপনের একটু খাতির ছিল। তপনের অভিনয়পটুতা ছিল, রঙ্গরসের ভূমিকায় তাঁকে মানাত সবচেয়ে বেশি। তাঁর চেহারা, হাত ও মাথা নাড়ার বিশেষ ভঙ্গী এবং গলার স্বরেই দর্শকরা সকলে হেসে খুন। 'রোগের চিকিৎসা' এবং 'বিনি পয়সার ভোজ' নকশা দুটিতে যথাক্রমে হারাধন ওরফে হারু এবং আপিস-ফেরতা অক্ষয়ের ভূমিকায় তপনের অভিনয় দেখবার মতো হয়েছিল। তপনের গানের গলা ঠিক তাঁর মামাবাড়ির যোগ্য ছিল না বললে অপপ্রচার হবে না। সেইটেই ছিল তপনের মনের দুঃখ। কিন্তু কোথায় সে দুঃখের লাঘব করবেন, না আরও সেটা উসকিয়ে দিতেন তাঁর দিনুদা। সন্ধ্যার সময় গানের ক্লাসের দিকে তপনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই দিনুবাবু যেন আঁৎকে উঠে বলে ফেলতেন— 'ঐ রে!' নেহাৎ আত্মীয় না হলে কি এমন কেউ করে? শান্তিনিকেতন থেকে আমাদের পরের বছর প্রবেশিকা পার হয়ে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করে তপন বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। পরে তিনি পশ্চিম-বাংলা সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটার জেনারেলের পদে নিযুক্ত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেই সময়ে বাংলা দেশের বহু গণ্যমান্য বনেদী বংশের উইল ও নানা রকমের দলিল দেখে ইংরেজ-রাজত্বের আদিযুগে বাংলাদেশের রীতিনীতি এবং সামাজিক অবস্থার অনেক তথ্য আহরণ করেন ও এ বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' বইখানার তুলনা মেলে না। যেমন তাঁর ভাষা তেমন তাঁর খুঁটিনাটি তথ্যসংগ্রহ— তদানীন্তন বাংলা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন অতি মনোরম করে। তাঁর লেখা 'স্মৃতিরঙ্গ' ও 'বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা'ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তপন এখন বিশ্বভারতীর কাজে নিজের শ্রম ও সময় ব্যয় করছেন শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও।

হিতেন হীরেন ও নরেন ধর্মনিষ্ঠ মথুরানাথ নন্দী মহাশয়ের তিন পুত্র। হিতেনের সে আমলে নানা বিষয়ে উৎসাহের অন্ত ছিল না। তিনি বিশেষ ব্যায়ামপটু ছিলেন। কোদোর মতো লম্বা লম্বা টানে কুয়ো থেকে জল তুলতে ছিলেন ওস্তাদ। হীরেনও ফুটবল খেলতেন ভালো। আমেরিকায় পড়তে গিয়ে তিনি সেখানে রয়েই গেছেন এবং সেখানেই ডাক্তারি করছেন। নরেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছেলেবয়স থেকেই। ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ঈশ্বরোপাসনা ছিল তাঁর

নৈতিক কৃত্য, এখনো তাই আছে শুনতে পাই। তিনি নিজ জীবনে যা সত্য বলে জেনেছেন তাকে এতটুকু খাটো করে কোনোরকম রফা-বন্দোবস্তে তিনি রাজি হতেন না। কোনো একটা বিষয়ে গুরুদেবের সঙ্গে মতের অনৈক্য হওয়ায় নরেন বিনা দ্বিধায় আশ্রম ছেড়ে চলে গেছেন— আর তাঁকে ফিরিয়ে আনা যায় নি। প্রমোদদার ভাইয়ের নাম ছিল তরুণকুমার রায়। প্রমোদদার ছিল বেশ দোহারা চেহারা, তরুণ ছিলেন লিকলিকে রোগা। প্রমোদদার রঙ ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং তরুণ ছিলেন তামাকের টিকের মতো মিশকালো। সেই অপ্রিয় সত্যটায় আগুন ধরিয়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় অনেকে তাকে ডাকত টিকে রায় বলে। তরুণকুমারের বলবার কিছু ছিল না— তার নামের আদ্যক্ষর টি.কে.ই তো। পরে বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তরুণ কলকাতা করপোরেশনের উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। গানের ক্লাসে তরুণের ভালো গাইয়ে বলে পশার ছিল। বেশ ক বছর পরে আমার ভাই নিশীথরঞ্জনও কিছুদিন আশ্রমে বাস করে গেছেন। 'ধন্যি ভায়ের অধ্যবসায়' বলতেই হবে। ঘটনাটা খুলেই বলি। একবার স্পোর্টস্ হচ্ছিল। একটা ছিল হুইল রেস— অর্থাৎ চাকা ঠেলে দৌড়ে যাওয়া। নিশীথ তাতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছেলে যখন রেস শেষ করে জিতে গেছেন এবং বাকি সকলে রণে ভঙ্গ দিয়ে হাস্যমুখে বসে পড়েছেন, ভায়া তখনো কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে চাকা মেরেই চললেন যতক্ষণ না সারা পথটা শেষ হল। মাঠসুদ্ধ লোক হেসে খুন, কিন্তু নিশীথের তাতে গ্রাহ্যই ছিল না। পরে গ্লাসগো থেকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ডিগ্রি নিয়ে দেশে আসেন। এখন তিনি ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে অধিষ্ঠিত আছেন— নিজের কেরামতি এবং বোধ করি সেই বালক বয়সের অধ্যবসায়গুণে। মনোরঞ্জনদার ছোটো ভাই সরোজ, যার ডাকনাম ছিল রত্নু, তিনি আমার নীচের ক্লাসে পড়তেন। কিন্তু বয়সে আমার সমান ছিলেন বলে সুহৃদের মতো তাঁর সঙ্গেও আমার সদ্ভাব ছিল বিস্তর। সরোজ খেলাধুলায় ভালো ছিলেন। কাব্যের ঢেউ কবিতায় পৌঁছতে দেখি নি বটে, তবে মাথার চুলে দেখতে পাওয়া যেত। সরোজের মনের স্ফূর্তির সীমা ছিল না। চীনেদের মতো হাত পা নেড়ে এবং বিড় বিড় অবোধ্য উচ্চারণে সরোজ অনর্গল বকে যেতেন, যেন বিশুদ্ধ চীনে ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। সে বক্তৃতার প্রহসন শোনবার মতো।

জ্যোৎস্নালোকে

মেলার যাত্রী

ত্রিপুরা না কুমিল্লা থেকে এসেছিলেন কবিযশঃপ্রার্থী গিরিজা— পদবী বোধ হয় চক্রবর্তী। বিজুদার কাছ থেকে 'কপিরাজ' উপাধি পেয়ে গিরিজা বেশ কিছুটা মুষড়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল সে কথাটা পরে বলব। মুকুল দে থাকতেন 'বাগান'-বাড়িতে। অতি বিচিত্র ধরনের ছেলে তিনি ছিলেন। কাপড়চোপড়ের দিকে কোনো নজরই ছিল না, জামাটার বুকে কিংবা হাতাটায় হয়তো বোতামই নেই— কে তার খবর রাখে। পড়াশুনার জন্যে তাঁর খ্যাতি বিশেষ রটে নি এবং সে দিক থেকে তাঁর মনও তেমন ছিল না। ক্ষিতিবাবু বলতেন, 'ওর মূলের মধ্যিখানেই ওর বাবা মা বসিয়ে দিয়েছেন 'কু'— ওর আর কী হবে।' কিন্তু মুকুলের ড্রইংএর হাত ছিল অসাধারণ। পরে তিনি অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ছবি আঁকা শিখে বিলেতে থেকে এচিং ভালোরকম আয়ত্ত করে ফিরে এসে কলকাতার সরকারী আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হন। ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট শিল্পী বলে তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। কী করে মুকুলের চিত্রনৈপুণ্য ধরা পড়ল সে গল্প পরে বলব।

কিছু আগেপিছে এসেছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। স্কুলের পড়াশুনার চেয়ে কীটপতঙ্গের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। পিঁপড়ের বাসা এবং উই-ঢিবির যাবতীয় নকশা তাঁর জানা ছিল। গুটিপোকা পোষা তাঁর এক বাতিক ছিল। এ-সব বিষয়ে কিছু কিছু রচনাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বয়সে নবীন হলেও গুরুদেব ও বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবীণদের মহলেই ছিল তাঁর আনাগোনা— তাঁর কথাবার্তা বলবার ধরনটাও ছিল বিজ্ঞের মতো। বড়োদের সঙ্গে জমে যাওয়ার এই অভ্যাসটা ছিল বলে সুধাকান্তর ঘন ঘন ডাক পড়ত নিচুবাংলায় এবং সেই সূত্রে তিনি বড়োমার দাওয়ায় পাত পাতবার কায়েমী বন্দোবস্তও করে ফেলেছিলেন। সমান রসবোধ ছিল তাঁর সাহিত্যে ও ভোজ্যসামগ্রীতে। এখন তিনি শ্রীনিকেতনের পাব্‌লিক রিলেশন্‌স্‌ অফিসার বা জনসংযোগ-সচিব। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতিকথায় গুরুদেবের জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আর ছিলেন কিরণ— খাইয়ে ছেলে বলতেই হবে। দিস্তে-খানেক রুটিতে তাঁর মন উঠত না। সতীশ ঠাকুর এবং চণ্ডী ঠাকুর তাঁকে চিনে রেখেছিল, সুতরাং খাবার সময় রসদ-সরবরাহে ক্রটি করত না। একবার অন্য ছেলেদের সঙ্গে কিরণও ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ক্ষিতিবাবুর তত্ত্বাবধানে। জনৈক আশ্রমবন্ধুর বাড়িতে রাত্রে খেতে বসে অন্য

সকলে যখন প্রায় হাত গুটিয়েছেন, কিরণের খাওয়া তখনো চলেছে সশব্দে। ক্ষিতিবাবু পরিহাস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রে কিরণ, আর কিছু দেবে?' অন্য ছেলে হলে তক্ষনি হয়তো বুঝত ইঙ্গিতটা, কিন্তু কিরণচন্দ্র প্রসন্নমুখে জবাব দিলেন— 'থাকে তো দেবে।' সেই থেকে কিরণের খ্যাতি রটে গেল যে ভোজন-ব্যাপারে কিরণের দোসর মেলা কঠিন। প্রমথ বিশীও আসেন এই সময়ে অত্যন্ত ছোটো বয়সে। কোনো কথা না বুঝলে বিশী মেনে নিতে পারতেন না, তর্কের জন্যেও তাই তাঁর খ্যাতি ছিল। বিশীর বরাবরই সাহিত্যের দিকে ঝোঁক ছিল, এখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশা। কী প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি শান্তিনিকেতনের আদিযুগের কথা লিখেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইখানিতে, পড়লে মনে জেগে ওঠে পুরানো দিনের কত কথা। স্বর্গীয় বরদাকান্ত রায় ছিলেন বিহার সরকারের একজন নামকরা সিভিল সার্জন; এমন অমায়িক, মিতভাষী এবং আদর্শবাদী পুরুষ কমই দেখেছি— গুরুদেব ও আশ্রমের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর বড়ো ছেলেটি ছাড়া অন্যান্য পাঁচটি ছেলেই শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছেন; এঁদের মধ্যে বড়ো জ্যোতিষ এ দেশে এবং ইউরোপে ডাক্তারি শিক্ষা লাভ করে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে কাজ করছেন, ক্ষিতীশ ইউরোপে শিক্ষা পেয়ে আমাদের দেশের একজন কৃতী ভাস্কর বলে প্রখ্যাত হয়েছেন। ধীরেন মুখুজ্জে ছিলেন মাস্টারমশায় যতীনবাবুর ভাই— সংক্ষেপে তাঁকে ডাকা হত ধীমু বলে। অনুমান করি ধীরেন সেন কিংবা রংপুরের ধীরেন রায়চৌধুরীর সঙ্গে পাছে গোলযোগ হয়ে যায় এই ভয়েই এঁকে এই ছোট্ট নাম দেওয়া হয়েছিল। বিভূতি গুপ্ত ছিলেন ধীমু ও নরেন নন্দীর সমবয়সী। পড়াশুনা সাঙ্গ করে এই তিন বন্ধু শান্তিনিকেতনে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন, পরে তিনজনে মিলে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের অনুরূপে একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতায়। নেহাৎ আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে সে বিদ্যালয়টি বাড়তে পারে নি এবং পরে তাকে বন্ধই করে দিতে হয়। যতদূর খেয়াল আছে আমার ফেরবার পর প্রভাতদা— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়— এসেছিলেন। তেজেশদার মতো প্রভাতদাও পড়তে এসেছিলেন, না পড়াতে এসেছিলেন, ঠিক মনে নেই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কিছুকাল মাস্টারি করে প্রভাতদা পরে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক হয়ে বহু বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন। শান্তিনিকেতন

গ্রন্থাগারে এখন যে-সব সুবন্দোবস্ত হয়েছে এর মূলে রয়েছে প্রভাতদার অক্লান্ত পরিশ্রম। প্রভাতদার সাহিত্যিক সামর্থ্য দেখা গিয়েছে 'রবীন্দ্রজীবনী'-রচনায়। বহু বৎসর ধরে বহু পরিশ্রমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তবেই এই সুবৃহৎ জীবনী রচনা সম্ভব হয়েছে। আশ্রম থেকে একটু দূরে প্রভাতদা এখন সপরিবারে ভুবনডাঙার কাছে বাসা বেঁধেছেন। তাঁর ছোটো ভাইকে আমরা 'সু' বলেই চিনি। তিনি ব্রহ্মদেশে বহুকাল ছিলেন, এখন আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন। তুহিনশুভ্রকে মনে আছে তাঁর অভিনব নামটারই জন্যে বোধ হয়। তাঁর গানের গলাটি ছিল চমৎকার। বাবা বংশুর যে ভালো নাম একটা কিছু ছিল বা আছে তা টের পেলাম সেদিন রবীন্দ্র-মেলার অনুষ্ঠানপত্রে। কি করে শ্রী পি. কে. সেন বাবা বংশু হয়েছিলেন সে ইতিহাস আমি তো জানি নে। এখন তিনি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের অন্যতম জনসংযোগ-সচিব। এ ছাড়াও মনে পড়ে হৃষীকেশ সিংহ ও শশধর সিংহকে। 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয়ে রাজশ্যালক সেজে হৃষীকেশের নামই হয়ে গিয়েছিল 'মামা'। শশধর কৃতী ছাত্র। লণ্ডনের পিএইচ. ডি. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে ভারত-সরকারের প্রকাশন-বিভাগে অধ্যক্ষ ছিলেন। আরও মনে পড়ে অতুলদা, হরগোবিন্দ, শুধু-গোবিন্দর কথা— আরো কত ছেলে এল আর গেল। যাঁদের নাম এখানে উল্লিখিত হল না, তাঁরা যে সম্মানার্হ বা স্মরণীয় নন, এমন কেউ যেন কল্পনাও না করেন— আমার স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতাই অনুল্লেখের একমাত্র কারণ; আর, সকলের সঙ্গে উত্তরজীবনে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি— জীবনস্রোতে নৌকা ভাসিয়ে কে কোন্ দিকে চলেছি তার ঠিক নেই।

সেবার আশ্রমে ফিরে নজরে পড়ল আর-একটা জিনিস। প্রথম যখন আশ্রমে এসেছিলাম তখন বিদ্যালয়ে মেয়ে-পড়ুয়া কেউ ছিলেন না। এবার দেখলাম বেশ কজন মেয়ে পড়ছেন ছেলেদের সঙ্গে। ঢাকার প্রসন্ন সেন মশায়ের দুই কন্যা হিরণ ও ইন্দু তখন এসে গেছেন। হিরণদি পরে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে নেপাল রাজ-পরিবারের মেয়ে-ডাক্তার হয়েছিলেন। প্রফুল্লর বোন টুলুও তখন পড়তেন সেখানে। এখন তিনি ও তাঁর স্বামী শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লীতে বসতি করছেন নিজেদের বাড়িতে। প্রমোদদা ও তরুণের দুই বোনও পড়তেন ছেলেদের সঙ্গে—

প্রতিভা ও সুধা। মোহিতবাবুর কন্যা-দুটি— মীরা আর বুলা— তখনো আশ্রমে ছিলেন, না চলে গিয়েছিলেন, মনে নেই। বাংলাদেশের বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়ার ব্যবস্থা এই বোধ হয় প্রথম।

নবম অধ্যায় [বীথিকা

আশ্রমের ছেলেরা প্রায়ই একটা-না-একটা নাটক কি নকশা অভিনয় করতেন তা আগেই বলেছি। দৃশ্যপটের বালাই ছিল না। নাট্যঘরের পূর্ব-দিকের উঁচু মেঝেটাই ছিল আমাদের রঙ্গমঞ্চ। সেখানে দু ধারে গাছের ডাল লাগিয়ে, তাতে দেবদারু-পাতা বেঁধে, আমাদের নানা রঙের পট্টবস্ত্র টাঙিয়ে অতি চমৎকার রুচিসংগত রঙ্গমঞ্চ নিখরচায় হয়ে যেত। এক সময়ে একতলা লাইব্রেরি-বাড়িটিকে খড়ের চালা দিয়ে দোতলা করা হয়েছিল। আমরা কজন বড়ো ছেলে তখন সেখানে থাকতাম, সঙ্গে থাকতেন একজন অধ্যাপক। সেই দোতলা ঘরে গিরিজাও থাকতেন। কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা-লাভের আশা যখন আর প্রায় নেই তখন গিরিজা মনে করলেন চিত্রশিল্পীরা কবিদেরও উপরে। তাঁর ছবি আঁকার হাত কিছু অবশ্যই ছিল। গিরিজা ঠিক করলেন, একটা যবনিকা-পট আমাদের রঙ্গমঞ্চের জন্য নেহাত দরকার। তখনই তিনি লেগে গেলেন মস্ত একটা পট আঁকতে। অনেক গবেষণা করে গিরিজা বললেন যে, একটি সাপকে পাকিয়ে যদি 'ওঁ'-এর মতো দাঁড় করানো যায় তবে সেটা দেখতেও যেমন মনোরম হবে তার ভাবার্থও তেমনি হবে সুগভীর।

কিন্তু সাপটি তো নিজে নিজেই পাক খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না— একটা কিছু আশ্রয় করেই সাপ সাধারণত পাক খায়। তখন বুঝলাম যে গিরিজা কোনো জায়গায় শ্রীকৃষ্ণকে জড়ানো ওঁকারের আকার একটি সাপের ছবি দেখেছেন। অনেক আলোচনার পর স্থির হল যে একটি মৃণালকে জড়িয়ে সাপ আঁকলেই চলবে। লেগে গেলেন গিরিজা তার রঙ তুলি নিয়ে। রোজ রাত্রে তিনি চিত্রপট আঁকতেন আলো জ্বেলে, বিশুদার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও। বিদ্যালয়ের অন্য ছেলেরা জানত না কিছুই। তার পর একদিন কী একটা অভিনয়ে সেই পটটি ঝোলানো হল। ছোটো ছেলেরা খুব খুশি জৌলুসে আর গন্ধে। কিন্তু মাস্টারমশায়রা জনে জনে যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করলেন সে-সব লোক ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। গিরিজা-ভায়ার চিত্রকলার প্রয়াস এইখানেই শেষ হল। ফিরে তিনি আবার কবিতা লিখতে লেগেছিলেন কি না আশ্রমের ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ নেই। আমাদের 'বাগান'-বাড়ির মুকুল দের তখন আঁকিয়ে বলে কিছু খ্যাতি হয়েছে। চিত্রসম্পদে তাঁদের মাসিক পত্রিকা 'বাগান' বড়োদের মাসিক পত্রিকা 'শান্তি'র অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল। 'শান্তি'কে হারিয়ে দিয়ে 'বাগান'এর চিত্র-সম্পাদক মুকুল ঠিক করলেন যে এবার দোতলা ঘরের বড়ো ছেলেদের দম্ভটাকে দমিয়ে দেওয়া বিশেষ দরকার। পরম্পরায় খবর পেলাম মুকুল কী একটা ফেঁদে বসেছেন— রোজ রাত্রে তিনি কী করেন 'বাগান'এর ছেলেরা কাউকে কিছু বলবে না। শেষে আর-একটি অভিনয়ের দিন এল। দর্শকেরা সবাই সমাগত। কলকাতা থেকেও অনেকে এসেছেন। আমরা বড়ো ছেলেরা দল বেঁধে এক জায়গায় বসলাম— আমাদের মুখের ভাবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, এবার মুকুলেরও গিরিজার দশাই হবে। আস্তে আস্তে যখন যবনিকার উদ্‌ঘাটন হল, দেখলাম, নন্দবাবুর সুবিখ্যাত নটরাজের প্রলয়-নৃত্যের একেবারে হুবহু অনুকৃতি। সমবেত দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে সাধুবাদ দিলেন। আমরাও মুকুলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের হৃদয়মনের প্রসার প্রতিপন্ন করলাম। গুরুদেব খুব খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে এটি করেছেন?' তাঁকে বলা হল এটি মুকুলেরই কীর্তি। শুনেছি এর পরেই মুকুলের অভিভাবকের কাছে গুরুদেবের চিঠি গেল যে, লেখাপড়ার চেয়ে শ্রীমানের ছবি আঁকাতেই প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা বেশি। অচিরে সাব্যস্ত হল যে মুকুলকে

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হবে ছবি আঁকা শিখতে। জোড়াসাকোঁর বাড়িতে কিছুকাল থেকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভ করে মুকুলচন্দ্র বিলেতে গিয়ে এচিং শিখে কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের স্থায়ী অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলেছি। একবার আশ্রমে গিয়ে মুকুলের স্টুডিয়ো-ঘরে বসে তপন, আমি ও মুকুল গল্পগুজব করছিলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন উঠে আসব মুকুল তখন দেখালেন— কোন্ তক্কে আমার একটা ছবি এঁকে ফেলেছেন। ছবিটি তিনি দু-একবার আমাকে দিতেও চেয়েছেন। তবে তিনি দাম যা হাঁকলেন সেটা আমার মতো লোকের ছবি হিসাবে একটু অতিরিক্ত বলেই নেওয়া হয় নি। ছবিটি এখনো মুকুলের অ্যালবামে আছে— ছবির বাজার যদি নামে তবে সংগ্রহ করা যাবে, যদি-না ইতিমধ্যে উপহার-স্বরূপ পেয়ে যাই।

১৩১৫ সালের পূজার ছুটির অব্যবহিত পরেই যখন আশ্রমে ফিরলাম তখন 'শারদোৎসব' সবে প্রকাশিত হয়েছে— বারান্তরে ও ঈষৎ রূপান্তরে এই নাটকেরই নাম হয় 'ঋণশোধ'। সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয়ের মহড়া শুরু হয়ে গেল। ঢুকে পড়লাম ছেলের দলে। 'শারদোৎসব'এর গানের সুর ছিল সবই সুললিত। সমবেত কণ্ঠে গানগুলি জমত অতি সহজেই। এক-একটি গান যেন এক-একটি শিউলি ফুল— মনকে পবিত্রতায় ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে ফেলত। ঐ গানগুলির মধ্যে এমন একটা আনন্দহিল্লোল ব্যাপ্ত ছিল যার রেশ রয়ে গেছে আমার মনে এই বৃদ্ধ বয়সেও। এই তো সেদিন বর্ষাশেষে এক প্রত্যুষে চমৎকার সূর্যোদয় হয়েছিল কালিম্পং পাহাড়ে, সোনালি আলোয় আকাশ ভরে গিয়েছিল— আপন মনে 'স্বপনপুরী'র বাগানে পায়চারি করছিলাম, বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনের গভীর গোপনে একটা আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তুলছিল ; নিজের অজানিতে সে ঝংকারে গুনগুনিয়ে উঠছিল অতীতের একটা সুর— বুড়ো বয়সের ভাঙা গলায় আচমকা গান বেরিয়ে এল—

'আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।'

মনের মধ্যে ফিরে পেলাম হারানো কৈশোর। আর যাবে কোথায়— একের পর এক শারদোৎসবের সব-কটি গানই গেয়ে ফেললাম, হয়তো কত ভুল সুরে, কিন্তু স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দ-আবেগে। নিজের অন্তরে নিবিড় করে সে গানগুলি

উপভোগ করেছিলাম সেদিন প্রভাতে বহুদিন পরে। 'স্বপনপুরী'র উপরেই 'চিত্রভানু'। সেখানে তখন ছিলেন প্রতিমাবৌঠান। হয়তো হাওয়াটা ওইদিক-পানেই বইছিল; হয়তো তিনি উপরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। পরের দিন দেখা হতেই বললেন, 'কী সুধীরঞ্জন, কাল তুমি গান গাইছিলে?' জবাব দিলাম, 'শরতের সোনার আলোর ছোঁয়াচ লেগে কেমন যেন গান পেয়ে বসেছিল।' বৌঠান হেসে বললেন, 'তাই তো শুনলাম— তবে তুমি দেখছি এখনো সেই শারদোৎসবেই ঠেকে আছ।' অত্যন্ত খাঁটি কথা। আমার জীবনে কিশোর বয়সের শারদোৎসবের জের আজও ফুরোল না। গুরুর ঋণশোধ করতে না পারার বেদনা উপনন্দের মতো আমিও প্রাণে অনুভব করি। যাক, যা বলছিলাম। জুটে পড়লাম ছেলের দলে। ক্ষিতিবাবু তখন নূতন এসেছেন, তিনি হলেন সন্ন্যাসীবেশে রাজা। অজিতবাবুকে করা হল ঠাকুরদা। যতদূর মনে পড়ে জগদানন্দবাবু নামলেন লক্ষেশ্বরের ভূমিকায়। নরেন খাঁ হয়েছিলেন উপনন্দ। লক্ষেশ্বর যখন হিসেব লেখার খাগের কলমটা কানে গুঁজে ছুটতে ছুটতে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তাঁর সেই চেহারা দেখেই সকলে অভিভূত। হাসির রোল পড়ে গেল যখন তিনি 'ছেলেগুলো তো জ্বালালে। ওরে চোবে, ওরে গিরিধারীলাল, ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।' ব'লে আমাদের ধরে ফেলবার ভান করতে লাগলেন। সে হাসি কি থামে সহজে! তার পর সন্ন্যাসীর চেলা হবেন কথা দিয়ে কিছু পরেই যখন লক্ষেশ্বর ফিরে এসে বললেন 'ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলাম— পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়' তখন আবার উঠল হাস্যরোল। 'পারব না' এই দুটো কথা বলতে গিয়ে তাঁর যে মুখভঙ্গী আর মাথানাড়া দেখেছি, যে কণ্ঠস্বর শুনেছি, বর্ণনা করে বোঝানো শক্ত। গজমোতির কৌটাটি বুকে চেপে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে লক্ষেশ্বরের রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান-দৃশ্য আজও ভুলতে পারি নি। ক্ষিতিবাবুর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর সন্ন্যাসীর সুগভীর বাক্যগুলিকে আরো যেন অর্থদ্যোতক করে তুলেছিল। আতিশয্যহীন অভিনয়ে কথাগুলি যেন সজীব হয়ে আমাদের বালক-মনকেও স্পর্শ করেছিল। সন্ন্যাসীর গানগুলি গুরুদেবই গেয়েছিলেন অন্তরাল থেকে। তেমনি উৎকৃষ্ট হয়েছিল ঠাকুরদার ভূমিকায় অজিতবাবুর অভিনয়। আমরা বালকের দল কেউ-বা ধরছিলাম তাঁর ডান হাত, কেউ-বা তাঁর বাঁ হাত, আবার কেউ-বা ধরে টানছিলাম তাঁর গেরুয়া জামা বা চাদরের

দিনেন্দ্রনাথ

জগদানন্দ রায়

খুঁটটা। আর সকলে মিলে তাঁর চারি দিকে হাততালি দিয়ে নেচে নেচে গাইছিলাম, 'আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি।' গানের সুরে যেন মুক্তা ঝরছিল। অভিনয় দেখে খুশি হয়েছিলেন সবাই। আশ্রম-বালকদের গানের খ্যাতি অচিরে ছড়িয়ে পড়েছিল মুখে মুখে। পরের বছর আবার শারদোৎসব অভিনয় হয়েছিল। এবারে তপনমোহন লক্ষেশ্বরের এমন নিখুঁত রূপ ফুটিয়েছিলেন যে তার অভিনয়-খ্যাতি শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

এইবারে 'বিসর্জন' অভিনয়ের কথা উল্লেখ করি। ভোলা হলেন মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, নরেন খাঁ সাজলেন রানী গুণবতী; রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন পটলদা এবং নক্ষত্র রায় হলেন সোমেন্দ্র। মনোরঞ্জনদা নিলেন জয়সিংহের বেশ এবং আমি হলেম অপর্ণা। আমার মেয়ে-ভূমিকায় অভিনয়ের এই হল হাতেখড়ি। আমার মতো কালো ছেলের অপর্ণা সাজবার কথায় হাসির কোনো কারণই নেই, কেননা নরেন খাঁ যিনি রানী গুণবতী সেজে-ছিলেন তাঁর কালিমা আমার চেয়ে বেশি বৈ কম ছিল না। তা ছাড়া কী একরকম গুঁড়ো জিঙ্ক-পাউডার ছিল, তার এক আস্তর পড়লে চলনসই ফরসা কেউ না হয়ে যায় না। গুরুদেব নিজে আমাদের রঙ লাগিয়ে বেশভূষা পরিয়ে দিয়েছিলেন। লোকের মুখে শুনেছি আমাদের সাজগোজ খুব স্বাভাবিক হয়েছিল। আগের আগের মতো এবারেও গুরুদেব আমাদের অভিনয় শিখিয়েছিলেন। যতক্ষণ আমাদের আবৃত্তির ধরন, হাত-পা নাড়া ও চলাফেরা তাঁর পছন্দমত না হত ততক্ষণ কিছুতেই তিনি ছাড়তেন না। আর তাঁর পছন্দসই হলে অভিনয় যে চমৎকার হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথম দৃশ্যে দর্শকদের দিকে প্রায় পিছন ফিরে মন্দিরের বিগ্রহের সামনে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে 'মার কাছে কী করেছি দোষ' বলে গুণবতী যখন নাটকটি শুরু করলেন তখন এক মুহূর্তে দর্শকরা এমন নিস্তব্ধ হলেন যে, একটি ছুঁচ পড়লেও আওয়াজ শোনা যেত। শেষের দিকে—

'মা গো মহামায়া, এ কী তোর অবিচার!
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর— খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান— দে জননী,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভরে
যায় যাহে।'

এই কটি ছত্রে অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে নরেন খাঁ ফুটিয়ে তুলেছিলেন নিঃসন্তান রমণীপ্রাণের কাতর ক্রন্দন। ভোলার গম্ভীর কণ্ঠে অপূর্ব মনে হয়েছিল—

'দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মা'র সিংহাসন হতে— সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার ?'

এখনো কানে বাজে জয়সিংহের ভূমিকায় মনোরঞ্জনদার বেদনাপ্লুত কণ্ঠস্বর—

'প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর-সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা ! তবে
কেন মেঘ হতে ঝরে আশীর্বাদসম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ-'পরে,
গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে— কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া ?'

আরো মনে পড়ে—

'অপর্ণা, আবার এসেছিস ? তাড়ালেম
মন্দিরবাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে-পাশে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াস
সুখের দুরাশা-সম দরিদ্রের মনে ?'

তার পর যেভাবে বললেন—

'দেখ্ চেয়ে, গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত— কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ— বহুরাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব

ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই। থাক্
দেবী।'

সে আবৃত্তির তুলনা হয় না। রঘুপতির ভূমিকায় তেমনি ভালো হয়েছিল পটলদার অভিনয়। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে 'এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী' থেকে আরম্ভ করে নাটকের শেষ পর্যন্ত রঘুপতির কথাগুলি তিনি বলেছিলেন হৃদয়ের আবেগ-ভরা স্বরে। 'ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে' বলে যখন পটলদা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তখন অনেকের গায়ে নাকি কাঁটা দিয়েছিল। সোমেন্দ্রের অভিনয়ে সবাই খুব খুশি হয়েছিলেন। যখন

'দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখি, এক
বুলি জানে শুধু— রাজা হবে? রাজা হবে?'

বলতে বলতে কানে আঙুল দেবার আগে দুই চোখ আঙুল দিয়ে ঢাকবার প্রায় জোগাড় করেছিলেন, তখন দর্শক-মহলে হাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতে অভিনয়ের বিন্দুমাত্রও অঙ্গহানি হয় নি, কেননা নির্বোধ নক্ষত্র-রায়ের কাছে দর্শকেরা এই রকমই আশা করেছিলেন, এর চেয়ে উঁচুদরের অঙ্গসঞ্চালন কেউ প্রত্যাশাই করেন নি। শুনেছি অপর্ণার অভিনয়ও পরিপাটি রকমে উতরে গিয়েছিল। প্রথম দৃশ্যে, 'দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি' ছাগশিশুর বিয়োগে কাতর অপর্ণার উক্তি—

'এই-যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত? ওরে বাছনি আমার!
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারি দিকে ব্যাকুল নয়নে
কম্পিত কাতর বক্ষে— মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না?'

তৃতীয় দৃশ্যে, ব্যথিত অপর্ণার গান

'আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?'

এবং জয়সিংহের

'জান কি একেলা কারে বলে ?'

প্রশ্নের উত্তরে অপর্ণার উক্তি

'জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।'

অনেক দর্শকের মনকে স্পর্শ করেছিল বলে শুনেছিলাম। সম্পূর্ণ নাটকটির অভিনয়ই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল বলে অনেকে আনন্দপ্রকাশ করেছিলেন।

১৩১৬ সালের মাঘ মাসে রথীদার বিয়ে হল অবনীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। বিয়ের পরই বরবধূ আসবেন শান্তিনিকেতনে। রথীদা গুরুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম ছাত্র। সুতরাং তাঁর এবং তাঁর সহধর্মিণীর যথোপযুক্ত অভ্যর্থনার একটা আয়োজন করা দরকার। সাব্যস্ত হল গৌরদা প্রমুখ খেলোয়াড় ও পালোয়ান ছাত্রেরা তাঁদের ব্যায়াম-কৌশল দেখাবেন এবং অন্য ছেলেরা 'মালিনী' নাটক অভিনয় করবেন। অমনি তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। গৌরদা, বীরেন, হরগোবিন্দ, গোবিন্দ প্রভৃতি লেগে গেলেন শারীরিক কসরৎ অভ্যাসে, আর আমরা লেগে গেলাম অভিনয়ের মহড়ায়। মনোরঞ্জনদা হলেন সুপ্রিয়, ভোলা সাজলেন ক্ষেমংকর। নরেন খাঁ ও আমার তখন মেয়ে-ভূমিকায় অভিনয়ে কিছুটা খ্যাতি রটেছে। সুতরাং যথাক্রমে হলাম মহিষী ও মালিনী। যেদিন রথীদা ও প্রতিমাবৌঠান এলেন সেদিন বিকেলে দেখানো হল ব্যায়ামক্রীড়া। যুযুৎসুর সে কত-না প্যাঁচ। আনন্দের হিল্লোল উঠল যখন গৌরদার বুকের উপর দিয়ে চলে গেল গোরুর গাড়ির চাকা। কোথায় লাগে সার্কাসের রামমূর্তির খেলা! সন্ধ্যার সময় হল অভিনয়। গোড়া থেকেই সভা ছিল নিস্তব্ধ। মালিনীর কম্পিত কণ্ঠে—

'ভগবন্, রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে ;
সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে
আবদ্ধ ভ্রমরী— স্বর্ণরেণুরাশিমাঝে
মৃত জড়প্রায়। তবু কানে এসে বাজে
মুক্তির সংগীত, তুমি কৃপা কর যবে।'

এবং তার পর—

'আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—

যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে।'

এই-সব পদগুলির মধ্য দিয়ে মুক্তির আহ্বান ও নিজেকে নিঃশেষ করে দান করবার ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা শুনেছি দর্শকদের মনেও ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল।

'মা গো মা, কী করি তোরে লয়ে! ওরে বাছা,
এ-সব কি সাজে তোরে কভু, এই কাঁচা
নবীন বয়সে?'

বলতে বলতে মহিষী যখন রঙ্গমঞ্চে দ্রুতপদে প্রবেশ করে মালিনীকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন কে বলবে মহিষীটি তৃতীয় শ্রেণীর ছেলে নরেন খাঁ। অত্যন্ত স্বাভাবিক মেয়েলি ধরনে নরেন খাঁ বলেছিলেন মেয়ের চিবুক ধরে—

'মুখে খুলে পড়ে কেশ, একি বেশ! ছি মা!
আপনারে এত অনাদর! আয় দেখি
ভালো করে বেঁধে দিই। লোকে বলিবে কী
দেখে তোরে?'

এই-সব ছাপিয়ে উঠেছিল ক্ষেমংকরের বজ্রকঠিন চরিত্রের মহিমা এবং সুপ্রিয়ের উদ্দীপ্ত হৃদয়ের আবেগ। ভোলা আর মনোরঞ্জনদার সহজ সরল অভিনয়চাতুর্যে, নাটকের শেষ দৃশ্যে তা যেন অপরূপ মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শুনেছি রথীদা ও প্রতিমাবৌঠানের 'মালিনী' অভিনয় ভালোই লেগেছিল। পরে প্রতিমাবৌঠান আশ্রমের সকল শুভানুষ্ঠানে যুক্ত থাকতেন। আশ্রমবাসী সকলের প্রতি তাঁর মমতা ছিল, এখনো আছে। পৌষমেলায় তাঁর খাবারের দোকান খালি থাকত না। বৌঠান আশ্রমের অতিথি-অভ্যাগতদের খুব যত্ন করতেন। চিত্রাঙ্কনে তিনি নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, লেখেনও ভালো। স্বল্পভাষিণী মধুরস্বভাবা প্রতিমাবৌঠান গুরুদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন— আশ্রমের এবং গুরুদেবের নানা কাজে ও সেবায় সর্বদাই নিজেকে নানা ভাবে যুক্ত রেখেছিলেন।

অল্পকাল পরেই সন্তোষদার বিয়ে হল স্বনামধন্য ইন্দুমাধব মল্লিক মশায়ের

কন্যা শৈল দেবীর সঙ্গে। সে বিয়েতে কয়েকজন আশ্রমবাসীর কলকাতায় বরযাত্রী যাবার খুব উৎসাহ হল। ঠিক হল যে তাঁরা বিকেলের গাড়িতে গিয়ে আবার পরের দিন সকালের গাড়িতেই ফিরবেন। স্টেশন থেকে সটান বিবাহমণ্ডপে যেতে হবে। কন্যাপক্ষের বাড়ি ভবানীপুরে। কে পথ দেখাবে? আমি ভবানীপুরের ছেলে বলে আমার তলব পড়ল। জিজ্ঞাসা করায় আমি উত্তর দিলাম— 'আজ্ঞে, জানি বৈকি। পদ্মপুকুর রোডের মিত্তিরপাড়ার হেমেন্দ্র মিত্তিরের বাড়ির পাশ বরাবরই তো রাস্তা— চিনি বৈকি, খুব চিনি।' সুতরাং আমিও চললাম বরযাত্রীদের ছড়িদার পাণ্ডা হয়ে। বিবাহবাসর খুঁজে বের করতে কোনো কষ্টই হয় নি। বিবাহান্তে ভূরিভোজন সেরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে যখন বাড়ি পৌঁছলাম বাবা মা তো অবাক। আনন্দটা ক্ষণস্থায়ী— কেননা পরের দিনই চলে আসতে হল। সন্তোষদাকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম, ভালোবাসতাম। আশ্রমের 'পরে তাঁর অগাধ মমতা ও গুরুদেবের 'পরে বিশেষ ভক্তি ছিল। আশ্রমের সেবায় সন্তোষদা বিশেষ ত্যাগ-স্বীকার করে গেছেন। শৈলবৌঠান প্রকৃত সহধর্মিণীর মতোই সন্তোষদার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করতেন। নম্র মধুর স্নেহশীল ব্যবহার ছিল তাঁর।

মনে পড়ে আমরা যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠলাম তখন 'রাজা' অভিনীত হয়েছিল। সে অভিনয়ে খুব লোকসমাগম হয়েছিল। কলকাতা থেকে আশ্রমবন্ধু বহু অতিথি এসেছিলেন। আমাদের অভিনয় শেখাতে গুরুদেব খুব বেশি পরিশ্রম করেছিলেন। এক-এক দৃশ্য কত বার অভ্যাস করতে হয়েছিল। আঁধার ঘরের রানী সুদর্শনা সেজেছিলাম আমি। সুরঙ্গমা হয়েছিলেন যতদূর মনে পড়ে অজিতবাবুর ছোটো ভাই সুশীল, তার গানের খ্যাতি ছিল। গুরুদেব নিজে হলেন রাজা। দিনুবাবুকে খুব মানিয়েছিল ঠাকুরদার ভূমিকায়। মাস্টারমশায়দের কেউ-বা কাঞ্চী, কেউ কোশল, কেউ বিদর্ভের রাজা সেজেছিলেন। মহড়ার সময় সুদর্শনা যখন তাঁর অন্ধকারের রাজার বর্ণনা করে বলতেন—

'সে তো একরকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম— এমনি নেমে আসা, এমনি ঢেকে দেওয়া,

এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়া-মাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা।...'

যখন চারি দিকে আগুন জ্বলেছে তখন সুদর্শনা তাঁর রাজাকে বলছেন—

'যখন চার দিকে আগুন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলুম এই মালাটা আগুনে ফেলে দিই। কিন্তু পারলুম না। আমার পাপিষ্ঠ মন বললে, ঐ হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম। আমিও মরি নে, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা।'

গুরুদেব তখন বলতেন, 'ওরে সুধীরঞ্জন, বেশ হচ্ছে— কিন্তু আর একটু দরদ দিয়ে বল্' বলে নিজেই সেই কথাগুলি আবৃত্তি করতেন। এইরকম তাঁর নির্দেশমত যখন বলতে শিখলাম তখন খুব খুশি হলেন। নিজে তিনি আমাকে সাজিয়ে দিলেন বড়োমা ও মীরাদির কত-না গয়নাকাপড় দিয়ে। গলাটি যাতে আমাদের শ্রুতিমধুর হয় সেজন্যে নিজে গরম দুধে ডিম ফেটিয়েও খাইয়েছেন। এত তালিম দিয়ে যখন অভিনয় হল, দর্শকসমাজ সকলেই সমস্বরে সাধুবাদ দিয়েছিলেন। সুরঙ্গমার অভিনয়ও খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অদৃশ্য রাজার ভূমিকায় গুরুদেবের সুললিত অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর আজও আমার কানে বাজে, সেই রাত্রির অভিনয়ের কথা মনে করলেই। শুনেছি, প্রতিমা দেবীকে লেখা একখানি পত্রে গুরুদেব আমার চেহারা ও অভিনয়ের কিছু প্রশংসা করেছিলেন— সেইটেই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আর মনে পড়ে 'অচলায়তন' অভিনয়ের কথা। অচলায়তনের অন্তর্নিহিত সার কথাটি তখন যে আমাদের খুব বোধগম্য ছিল তা নয়, কিন্তু একটু এই আভাস পেয়েছিলাম যে ধর্মে ও সমাজে বদ্ধমূল সংস্কারের আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে যখন দুর্বল ও অভিভূত করে ফেলে, মানুষ যখন নিজের চারি দিকে গণ্ডি কেটে উঁচু পাঁচিল তুলে দিয়ে বিশ্বের আলোবাতাস বন্ধ করে নিজেদের শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করবার আয়োজন করে, তখন যিনি গুরু তিনি যোদ্ধবেশে আবির্ভূত হয়ে সেই কারা-প্রাচীর ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে মানুষকে হাত ধরে মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড় করিয়ে দেন, তার যন্ত্রবৎ নির্জীব দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার করে আবার তাকে পরিপূর্ণ মহিমায় উজ্জ্বল করে তোলেন। এইরকম একটা মোটামুটি ধারণা

মনের মধ্যে আবছায়ার মতো থাকাতে অচলায়তনের ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের মেলাতে আমাদের কষ্ট হয় নি। গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে গানে ও নৃত্যে অভিনয়টি মনোরমই হয়েছিল।

স্মৃতিকথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না উল্লেখ করি 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয়ের কথা। এটি করেছিলেন প্রধানত মাস্টারমশায়রা মিলে। ধীমুর দাদা যতীনবাবু হয়েছিলেন 'বিভা'। জগদানন্দবাবু সেজেছিলেন রাজজামাতা রামচন্দ্র। দিনুবাবু তখন ক দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন বলে তাঁর কথা ভাবা হয় নি। কিন্তু অভিনয়ের দিন-দুই পূর্বে হঠাৎ তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তো পদগুলি সবই বিলি হয়ে গেছে। কী উপায়— ভেবেচিন্তে তাঁকে করা হল রামচন্দ্রের সভা-গায়ক। যথাকালে খানদানী মুসলমানের শৌখিন পাজামা-পাঞ্জাবিতে, জরির কাজ-করা ভেলভেটের কুর্তায়, লক্ষ্ণৌ-টুপিতে আর রঙিন রেশমী রুমালে তাঁকে মনে হল সাক্ষাৎ তানসেন। নাটকের নির্দেশ ছিল যে সভার ওস্তাদ যখন গান গাইবেন তখন রাজা রামচন্দ্র বিজ্ঞ সমঝদারের মতো মাঝে মাঝে 'বাহবা ওস্তাদজী' বলবেন— আর ভুল জায়গায় তাল দেবেন। এ দিকে ব্যাপার হল এই যে, জগদানন্দবাবুর তালজ্ঞান যথেষ্টই ছিল, কাজেই বেতালে হাততালি দেওয়া তাঁর পক্ষে বড়ো সহজ হচ্ছিল না। অভিনয়ের মহড়ার সময় দস্তুরমত তাঁকে বেতালের সাধনা করতে হল। যখন অভিনয় হল, সেই দৃশ্য এল, তখন জগদানন্দবাবুর নিখুঁত ভাবে বেতালে হাঁটু ঠোকার বহর দেখে কে! যখন গানের মাঝখানেই তিনি হঠাৎ 'হ্যায়' বলে চেঁচিয়ে উঠে ওস্তাদের মতো হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তখন দর্শকেরা হেসে অস্থির। ও দিকে বেতালে তাল দেবার ঠেলায় দিনুবাবুর গানের মাথায় ডাণ্ডা পড়ে আর-কি। চোখে বিরক্তির ভাব আর মাইনে-করা ওস্তাদের কৃতকৃতার্থতার হাসি অতি অপরূপ মিলেছিল। হৃষীকেশ রাজশ্যালক সেজে সেই-যে 'মামা' নাম পেলেন সে নাম তাঁর কোনোদিন ঘুচল না।

দশম অধ্যায় [গৈরিক

আমাদের সময় কিছু কিছু উদ্ভট নষ্টামি যে হত না তা বলতে পারি নে। একটা বাঁদরামির বিষয় এখনো মনে রয়ে গেছে। সেবার আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি না গিয়ে আশ্রমেই থাকব এবং জগদানন্দবাবুর কাছে আমাদের অঙ্কের জ্ঞানটা ঝালিয়ে নেব— এইরকম কথা হয়েছিল। চিঠি লিখে বাড়িতে সে কথা জানিয়ে দিলাম। ছেলের পড়াশুনায় চাড় দেখে বাবা খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন। আমাদের সহপাঠীরাও বাড়ি থেকে অনুমতি পেলেন। মনোরঞ্জনদা থাকলেন বলে তাঁর ছোটো ভাই সরোজও রয়ে গেলেন। অন্যান্য ছেলেরা বাড়ি চলে গেলেন— আশ্রম প্রায় খালি হয়ে গেল। জগদানন্দবাবু ও আর দু-একজন ছাড়া মাস্টারমশায়রাও অনেকেই চলে গেলেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ভার নিয়ে রইলেন চণ্ডী ঠাকুর। আগেই বলেছি চণ্ডী ঠাকুর ছিলেন বেঁটেখাটো অথচ বেশ বলশালী লোক। ভয়ডর তাঁর ছিটেফোঁটাও ছিল না, অন্তত এই ছিল তাঁর বড়াই। হাতে লাঠি থাকলে ভূতপ্রেতের বাপের সাহস হবে না তাঁর কাছে এগোয়। অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে শ্মশানের গা ঘেঁষে পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে যেতে তাঁর এতটুকুও পরোয়া নাকি নেই। এক কথায় নিজের সাহসের গরব-গরিমায় চণ্ডীঠাকুর পঞ্চমুখ। সরোজ

একদিন বললেন, 'ওহে সুধীরঞ্জন, চণ্ডী ঠাকুরের বড্ড অহংকার হয়েছে— ওকে একটু শিক্ষা না দিলে তো আর চলে না হে।' পরামর্শ চলতে লাগল কী করে চণ্ডী ঠাকুরকে আক্কেল দেওয়া যায়। বড়ো রান্নাঘরের উত্তরে একটি খড়ের চালাঘরে ছিল ভাণ্ডার। তারই নিচু দাওয়াতে চণ্ডী ঠাকুর শুতেন রাত্তিরে। সরোজ, আমি আর ক'জনায় মিলে এক গভীর অন্ধকার রাত্রে ল্যাবরেটরি-ঘরে ঢুকলাম। সেখানে সত্যবাবুর আমলের নরকঙ্কালটা তখনো ঝোলানো ছিল। সেটাকে নামিয়ে তার চোখের কোটরের চারি দিকে এবং চোয়ালের উপরের ও নীচের হাড়গুলিতে জগদানন্দবাবুর সালফারের শিশিটা থেকে খানিকটা বের করে আচ্ছা করে ঘষা হল। ঘষাটা যতটা সোজা মনে হয়েছিল কাজে ততটা সোজা বোধ হল না— কেননা, হাত জ্বালা করতে লাগল। কিন্তু কী আর করা যাবে— চণ্ডী ঠাকুরকে তো শায়েস্তা করা দরকার, সুতরাং জ্বালা সইতেই হল। তার পর অতি সন্তর্পণে কঙ্কালটাকে বের করে নিঃশব্দ পদে গুটি গুটি গিয়ে চালের বাতায় তাকে টাঙানো হল। তার পর তার নীচের চোয়ালটার সঙ্গে একটা লম্বা সুতলি বেঁধে আমরা কজনা পাশের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ালাম। সুতলিটা টেনে দেখা গেল যে কঙ্কালের চোয়ালটা বেশ উঠছে আর নামছে। অন্ধকার রাত্তিরে কঙ্কালের সে কী ভীষণ মুখব্যাদান আর তার চক্ষুকোটর থেকে তারাহীন চোখের সে কী ভীতিপ্রদ চাহনি! এখন কথা হল চণ্ডী ঠাকুরকে কী করে জাগানো যায়। সরোজ গোটা-কয়েক কাঁকর কুড়িয়ে একটি একটি করে তাঁর দিকে ছুঁড়তে লাগলেন। একটা তাঁর গায়ে লাগায় তখনই চণ্ডী ঠাকুর মোড়ামুড়ি দিয়ে কঙ্কালের দিকে পাশ ফেরা মাত্র সরোজ সুতলিটা টানতে লাগলেন। আর যায় কোথায়! ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে নরকঙ্কাল তখন মুখ খুলতে আর বন্ধ করতে শুরু করলে! তাই-না দেখে চণ্ডী ঠাকুর তো গোঁ গোঁ শব্দে মূর্ছা যান আর-কি। ভয় হল লোকটি হার্ট ফেল করে মারা যাবে না তো? যখন দেখা গেল দু-একবার তাঁর পাশে শোওয়ানো লাঠিটার দিকে হাত বাড়ালেন তখন উলটো ভয় হল যে, যদি মরিয়া হয়ে লাঠিটা ভূতের গায়ে সজোরে মারেন একবার তবে তো সে ভূত চুরমার হয়ে যাবেই, পরের দিন জগদানন্দবাবু আমাদেরও আস্ত রাখবেন না। সরোজকে চুপি চুপি বললাম আশঙ্কার কারণটা। দেখলাম তাঁরও মনে ঐ একই কথা এসেছে। সুতরাং আমরা সমস্বরে খিল খিল করে হেসে উঠলাম। শেষে

সরোজ বললেন, “কী হে চণ্ডী, এইরকম করেই ভূতের সঙ্গে লড়াই কর নাকি!” লণ্ঠনটার আলো একটু বাড়িয়ে দিয়ে চণ্ডী ধাতস্থ হয়ে বললেন, ‘আমি বুঁঝো-ছিলাম, দাদাবাবুরাই বটে। মারছিলাম আর-কি লাঠির গুঁতো— ভূত ভেগ্যে যেত।’ লণ্ঠনের আলোয় দেখি চণ্ডীর গায়ে মুখে তখনো ঘাম ঝরছে। বললাম, ‘বটেই তো, এই তো বাপু গোঙাচ্ছিলে— শুনতে পাই নি? কালা কি?’ চণ্ডী তখন স্বীকার করলেন যে, কিছুটা ভয় হয়েই ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত সামলিয়ে যেতেন। রাতারাতি সকলে মিলে নরকঙ্কালটি নামিয়ে নিয়ে ল্যাবরেটরি-ঘরে যথাস্থানে টাঙিয়ে রেখে আমরা শুতে গেলাম। দিনের আলোয় কঙ্কালের চোখে মুখে সালফার তো দেখা যাবে না, সুতরাং ভয় নেই। আর শিশিটা থেকে যা খোওয়া গেছে তাতেও ধরা পড়বার ভয় নেই, কেননা জগদানন্দবাবুই তো বলেছিলেন যে, সালফার হাওয়ায় উবে যায় কিছু কিছু, হয়তো ছিপিটা ভালো করে আটকানো ছিল না। এই-সব জবাব মনে এঁচে নিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা কে জানে। ঘটনাটা চাপাই রয়ে গেল, কেননা আমাদের কেরামতিটা ব্যাখ্যা করতে পারলাম না জগদানন্দবাবুর ভয়ে, আর চণ্ডী ঠাকুর পারলেন না, তাঁর পৌরুষের পাছে হানি হয় এই ভয়ে। তবে ফলের মধ্যে এই হল যে, এর পর চণ্ডী ঠাকুরকে ভূতের সঙ্গে লড়াইয়ের বড়াই করতে আর কখনো শোনা যায় নি।

সারা গ্রীষ্মের ছুটিটা সকালে বিকেলে জগদানন্দবাবুর কাছে চলল আমাদের পাটিগণিত, জ্যামিতি আর বীজগণিতের চর্চা। সকালের ক্লাসটা নির্বিঘ্নে হয়ে যেত, মাঝে মাঝে গোল হত ঐ সন্ধ্যার ক্লাসে। ব্যাপারটা খুলেই বলি। অনেক গীতরচয়িতা প্রথমে গানের পদগুলি লেখেন, পরে তাতে সুর সংযোগ করেন বা করিয়ে নেন। এতে করে অনেকসময় কথায় এবং সুরে সামঞ্জস্য থাকে না। এ কথা এখন সকলেই জানেন যে গুরুদেবের বেশির ভাগ গানই আরম্ভ হয়েছিল সুরে, কথা এসেছিল পরে। কত সময়ে দেখেছি গুরুদেব নিস্তব্ধ হয়ে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের অমৃতধারা নিঃশেষে টেনে নিচ্ছেন নিজের অন্তরে গুনগুন করতে করতে। সেই সুরের অঙ্কুরকে পরিণত মূর্তি দেবার জন্যে কথা যেন আপনি আসত। আর যখনই এইরকম সুরের স্রোতে কথা জুটে একটি কোনো গান রচনা হত তখনি সেটি তিনি কাউকে শিখিয়ে দিতেন, নইলে সে সুর অনেক সময় আর তাঁর মনে থাকত না। যাঁর

অন্তরে স্বরের স্বরধুনী নিত্য প্রবাহিত হচ্ছে, তার একটি ঢেউ যে মিলিয়ে মিশিয়ে যাবে অন্য শত শত ঢেউয়ের মধ্যে তাতে আর বিচিত্র কী ! এইজন্যে তাঁর প্রয়োজন ছিল তাঁর 'গানের ভাণ্ডারী' দিনুবাবুকে। দিনুবাবু অনুপস্থিত থাকলে অনেক সময় অজিতবাবুকেও শিখিয়ে দিতেন। এখন হল কী, ঐ গরমের ছুটিতে যখন আমরা বাড়ি না গিয়ে আশ্রমেই রয়ে গেলাম, আশ্রমে তখন না ছিলেন দিনুবাবু, না ছিলেন অজিতবাবু। দায়ে পড়ে বলতে হল, আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কারো গানের খ্যাতি ছিল না। সুতরাং মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ত সন্ধ্যার সময়। ভাঙা কুলোও যেমন অনেক সময় কাজে লেগে যায়। দূর থেকে দেখা যেত লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে কে আসছে জগদানন্দবাবুর বাড়ির দিকে। তার পরেই দেখি স্মিতহাস্য উমাচরণ সসম্ভ্রমে সমাচার জ্ঞাপন করছে, 'আজ্ঞে, সুধীরঞ্জন-দাদাবাবুকে বাবুমশায় ডেকেছেন।' জগদানন্দবাবু যে খুশি হলেন না, তা তাঁর মুখের ভাবে ও চোখের চাহনিতেই বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু উপায় নেই ; বাবুমশায় ডেকেছেন, কাজেই ইচ্ছে না থাকলেও যেতেই বললেন। আমিও যেন একান্ত অনিচ্ছা নিয়ে উঠে পড়লাম। এই ব্যাপারটা যখন একটু নিয়মিতভাবে ঘটতে লাগল, জগদানন্দবাবুর অসন্তোষের তাপও দিনে দিনে বাড়তে লাগল বৈ কমল না। শেষে একদিন যেই-না দেখা গেল লণ্ঠনটি এগিয়ে আসছে তিনি বলে ফেললেন, 'আর কেন ধাষ্টামো— পা তো বাড়িয়েই আছ, উঠে পড়ো। বাবু-মশায়কে আমিও বলে রাখব যে তোমার পাস-ফেলের মধ্যে আমি নেই। পষ্ট দেখছি তুমি ফেল হবে আর আমারও নাম ডোবাবে। নাও, উঠে পড়ো।' আমি তখন গ্যাঁট হয়ে মাথা গুঁজে জ্যামিতির একটা নকশা আঁকতে লেগে গেলাম। 'কৈ হে, উঠছ না যে বড়ো— হল কী ?' আমি বললাম, 'না মশায়, আমি যাব না, কে শেষে গান শিখতে গিয়ে পরীক্ষায় ফেল হবে ?' জগদানন্দ-বাবু ভাবলেন তিরস্কারটা আর-একটু কড়া হলেই আমি উঠব। তাই বললেন, 'নাও, ঢের হয়েছে। লেখাপড়ায় এত মন কবে থেকে হল হে ? পড়াশুনোয় মন যদি থাকবে তবে তোমার বাপ-মা বাড়ি থেকে তোমায় দু-দুবার খেদিয়ে দেবেন কেন ? এঁদের বাপ-মায়েরা এঁদের একবারই খেদিয়েছেন। আর তুমি এমনি ছেলে যে তোমার বাপ-মা তোমাকে দু-দুবার বাড়ি থেকে তাড়িয়েছেন। বাস্ রে, কী ছেলে। যাও, যাও খসে পড়ো।' তখনো আমি নড়বার নাম

করি নে। অবশেষে মাস্টারমশায় দেখলেন, শাস্তির পন্থা অবলম্বন না করলেই নয়। বললেন, 'আহা দেখছ না? বাবুমশায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কাল সকালে না-হয় একটু আগে এসো— ঐ আঁকটা তখন ভালো করে বুঝিয়ে দেব।' দেখলাম যে এই অবস্থায় সন্ধি করাই শ্রেয়। সুতরাং উঠে পড়লাম। উমাচরণ মুচকি মুচকি হাসছে, আর মাস্টারমশায় খালি বললেন, 'বাস্‌ রে, কী ছেলে!' এর পরে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গান শেখা নিয়ে কোনো অসুবিধা হয় নি।

গুরুদেবের কাছ থেকে গান শিখে ফিরে আসতাম ঠিক রাত্রে খাবার ঘণ্টা পড়বার অব্যবহিত পূর্বে। খাবার পরেই এক বিশুদা ছাড়া প্রায় সবাই অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজকে কী গান শিখে এলে ভাই?' তখন তাঁদের শোনাতেই হত সেই সদ্য-শেখা গানগুলি, যা পরে গীতাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছিল। দিনুবাবু ফিরলে যে-কটা গান আমি শিখেছিলাম সেগুলি তাঁকে শুনিয়ে দিতে হয়েছিল। পরে তিনি সেগুলি আবার গুরুদেবকে শুনিয়ে ঠিক হয়েছে কি না জেনে নিলেন। একদিন এইরকম একটা নূতন গান শিখলাম—

'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।'

সেদিন রাত্তিরে গৌরপ্রাঙ্গণ ভেসে গেছে জ্যোৎস্নায়। খাবার পর সুহৃদ আর আমি মাঠে বেড়াচ্ছিলাম শরীরটা একটু জুড়োতে। সুহৃদের নির্বন্ধাতিশয্যে নূতন-শেখা গানটি গলা ছেড়ে গাইতে লাগলাম। গানটার প্রথম অন্তরাটা পেরিয়ে খাদের জায়গাটাতে পৌঁছতে-না-পৌঁছতে শুনলাম 'সুধীরঞ্জন! সুধীরঞ্জন!'— কণ্ঠস্বরেই বুঝলাম কোন মাস্টারমশায় ডাকছেন। গান মুলতুবি রেখে মাস্টারমশায়ের সামনে দাঁড়াতেই রুক্ষস্বরে তিনি বকলেন, 'লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, থিয়েটারি গান করবার আর জায়গা পেলে না? আশ্রমে গান হচ্ছে— হতভাগিনী জাগেন নি। যাও, এক্ষুনি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।' আমি নেহাত বোকার মতো বলে বসলাম, 'থিয়েটারি গান কী মশায়, গুরুদেব তো নিজে শিখিয়ে দিলেন আজকেই।' মাস্টারমশায়ের ঠিক যেন প্রত্যয় হল না, বললেন, 'হ্যাঁ, গুরুদেব শিখিয়েছেন!' আমি যখন তবু জোর করে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ— গুরুদেবই তো শেখালেন।' তখন তিনি বললেন, 'গা তো দেখি, শুনি।' আমি তখন আবার গানটির আদ্যোপান্ত তাঁকে শুনিয়ে দিলাম। শুনতে

শুনতেই দেখলাম মাস্টারমশায়ের মাথাটি নড়ছে। গান শেষ হলে খালি বললেন, 'হ্যাঁ, কথাগুলোর বাঁধুনি রয়েছে বৈকি! আচ্ছা যা, শুগে যা।' সুহৃদে আমাতে যে সেদিন গোপনে একটু হাসাহাসি করি নি সে কথা বলতে পারব না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর আবার আমাদের জীবনযাত্রা বাঁধা নিয়মের লাইন ধরে চলতে শুরু করল। দিনুবাবুর গানের ক্লাসে এই গানটা নূতন শেখা গেল—

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার॥
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার॥'

এই গানটার কথা আর সুর মনের মধ্যে প্রবল নাড়া দিয়েছিল তা সত্যি, কিন্তু গানটা এখনো মনে থাকবার অন্য কারণ ঘটে ছিল এই সময়ে, সেটা তবে খুলেই বলি। দিনুবাবু সে সময়ে কিছুদিন ছিলেন গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরি-বাড়ির তৃতীয় কামরাটাতে। নগেন আইচ মাস্টারমশায় তখন ছেলেদের সঙ্গে পাশের প্রাক্কুটিরেই থাকেন। নগেনবাবু বেশ সুর করে করে আমাদের নদী কবিতাটি পড়াতেন। এ ছাড়া দিনের বেলায় অন্য কোনো গান তাঁকে গাইতে শুনি নি কখনো। দিনুবাবু একদিন বললেন, 'ওরে, নগেনবাবুকে গানে পেয়েছে শুনেছিস।' আমরা বললাম, 'শুনি নি তো।' দিনুবাবু বললেন, 'গানে পেয়েছে নিশ্চয়ই জানি। এমনিতে আমার আপত্তি নেই— কিন্তু এই আমারই জানলাটার পাশে রাত দুপুরে না গাইলেই কি নয়? কী করা যায় বল্ তো?' 'তাঁকে ডেকে বলে দিলেই হয় যে একটু তফাতে মাঠের মধ্যে গিয়ে গাইলে ভালো।' দিনুবাবু বললেন, 'তা কি বলা চলে রে বোকা! দেখ কী করা যায়।' সেই দিনই একটু বেশি রাত্তিরে আমাদের ঘর থেকেও শুনতে পেলাম নগেনবাবু গুন গুন করে কী একটা গান করছেন। যেই-না নগেনবাবু গুনগুনিয়ে উঠেছেন অমনি দিনুবাবু এসরাজটা নিয়ে গান জুড়লেন—

'গভীর রাতে তোমার অত্যাচার
নগেন আইচ শত্রু হে আমার।

পারুলডাঙার পথে

তোমার গান কান্না-সম
আসে না ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে মোর যম
তোমায়   তাড়াই বারে বার।'

নগেনবাবুর গুনগুনানি নিমেষে থেমে গেল। তার পর থেকে আশ্রমে কেউ তাঁর গান শোনে নি কখনো।

এই সময়ের কাছাকাছি এমন একটা অঘটন ঘটল যে কিছুদিন আমরা অভিভূত হয়ে রইলাম। তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছেলে আমরা কজন লাইব্রেরি-বাড়ির পশ্চিম-দেয়ালের লাগাও নূতন ঘরটিতে থাকতাম। একদিন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরে গিয়েছে— রাত্রের খাওয়া শেষ হলে সুহৃদ ও আমি, আর কে কে বেরিয়ে পড়েছি খেলার মাঠে। বেহাগ সুরে একটার পর একটা গান করছি সবাই মিলে। হঠাৎ নজরে পড়ল, আমাদেরই ঘরের সামনে কারা লণ্ঠন নিয়ে ছুটোছুটি করছে। খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম, একটা অনির্দিষ্ট অমঙ্গল-আশঙ্কায় মনে কেমন যেন ভয় হতে লাগল। আমরা সব তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ঘরে। এসে দেখি ভোলা তাঁর বিছানায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন এবং গুরুদেব তাঁর পাশে একটা মোড়া না কিসের উপর স্তম্ভিতভাবে বসে আছেন, নির্নিমেষ চোখে ভোলার দিকে তাকিয়ে। একটা টিপাইয়ের উপর কয়েকটা বাইওকেমিক ওষুধের শিশি। একটু পরেই বোলপুর থেকে হরিচরণ ডাক্তারবাবু এসে যখন বুক পিঠ ও নাড়ী পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, বুঝতে পারলাম যে আমাদের সতীর্থটিকে আমরা হারালাম। গুরুদেবের তন্ময় মুখচ্ছবিতে যে দুঃখ ও করুণার ভাব ফুটে উঠেছিল আজও তা ভুলি নি। ভোলার হঠাৎ কী হল আমরা কিছুই বুঝলাম না, পরেও জানতে পারি নি। মনের মধ্যে বিশেষ করে জাগছিল এই কথাটা, শমী গেলেন ভোলাদের মুঙ্গেরের বাড়ি হতে, আর ভোলা চলে গেলেন গুরুদেবের আশ্রম থেকে। ভোলা ও শমীর মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল বলেই বোধ হয় এই কথাটা বারবার মনে আসছিল। প্রত্যুষে তাঁর দেহ সৎকার করে শ্মশান থেকে যখন সকলে ফিরলাম তখন রোদ উঠে গেছে। সেদিন আর আমাদের ক্লাস হয় নি।

একবার বুধবারের সঙ্গে অন্য তিন দিনের ছুটি এসে পড়ায় একটানা তিন-চার দিন ছুটি পাওয়া গেল। মাস্টারমশায়দের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, কটা দিন একটু বেড়িয়ে এলে ছেলেদের দেহমনের শ্রান্তি দূর হবে। ঠিক হল যে, ক্ষিতিবাবু সত্যেশ্বরবাবু আর বঙ্কিমবাবু কয়েকজন বড়ো ছেলেকে নিয়ে ভ্রমণে বের হবেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের অনেকেই আমরা দলে ভিড়লাম। যখন তোড়জোড় সব হয়ে গেল তখন প্রশ্ন উঠল কোন্ দিকে যাওয়া যাবে— পুবে, না পশ্চিমে। কেউ বললেন, ছেলেদের কলকাতায় জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, শিবপুর বাগান, মারবেল প্যালেস, এই-সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনা হোক। কেউ-বা বললেন, 'আরে ছ্যা— কলকাতায় ঘোরা কি হল ভ্রমণ? পশ্চিমের দিকেই যাওয়া যাক।' বঙ্কিমবাবু রফা করলেন— 'চলো তো স্টেশনে, যে দিক থেকেই হোক প্রথম যে গাড়ি আসবে তাইতেই চড়া যাবে।' এ একটা বেশ লটারির মতো নিষ্পত্তি হল। মঙ্গলবার অপরাহ্ণে হৈ হৈ করে স্টেশনে যাওয়া হল— বোলপুরের লোকেরা বুঝলে যে ঠাকুরমশায়ের ইস্কুলের দাদাবাবুরা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। স্টেশনের মাস্টারবাবুর কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, কলকাতার দিক থেকেই প্রথম গাড়ি আসবে, যাবে নলহাটি পেরিয়ে পশ্চিমের দিকে। সত্যেশ্বরবাবু বললেন, 'ঠিকই হয়েছে— নলহাটিতে জ্ঞানবাবুর (জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়) পিতা থাকেন তাঁর ভদ্রাসনবাড়িতে।

সেখানে না নেমে চলে গেলে তিনি খুবই ক্ষুণ্ণ হবেন।' কথাটা বঙ্কিমবাবু এবং ক্ষিতিবাবুরও মনে ধরল যেন। নলহাটি পর্যন্তই তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটা হল। গাড়িতে ওরই মধ্যে একটা খালি কামরা দেখে উঠে পড়া গেল। ট্রেন ছাড়তেই বঙ্কিমবাবু বললেন, 'ওরে ছেলেরা, ঐ যাত্রার গানটা ধর্-না।' অমনি আমরা শুরু করে দিলাম—

আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।

সে কামরায় আর যে কজন নিরীহ লোক ছিলেন, তাঁরা নিশ্চিত ভেবে নিলেন যে একটা যাত্রাদল চলেছে কোথাও পালা গাইতে। অবশেষে ট্রেন এসে থামল নলহাটি জংশনে। সকলে নেমে পড়লাম। সঙ্গে মালপত্রের কিছু হাঙ্গামা ছিল না। নিজের নিজের কম্বলের মধ্যে গুটিয়ে দুখানা ধুতি, কি পাজামা, একটি গেঞ্জি এবং একটি শার্ট কি পাঞ্জাবি নিয়েছিলাম প্রত্যেকে—পরনে ছিল ধুতির উপর গেঞ্জি, জামা, তার উপরে ছিল গেরুয়া আলখাল্লা, আর হাতে ছিল মাথা-সমান লাঠি। নিজের নিজের বোঁচকাটি কাঁধে কি বগলে নিয়ে রওনা হলাম জ্ঞানবাবুদের বাড়ির দিকে। পৌছলাম সন্ধ্যা নাগাদ। জ্ঞানবাবুর পিতাকে সত্যেশ্বরবাবু প্রথমেই বললেন যে, আশ্রমবালকেরা ভ্রমণে বেরিয়েছেন— রাত্রিতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই নিশিযাপন করে অতি প্রত্যুষে আবার রওনা হবেন। প্রভাতে সময়-সংক্ষেপ বলে আজ সন্ধ্যায়ই তাঁরা তাঁকে প্রণাম করে যেতে এসেছেন। এতগুলি লোকের রাত্রের বিছানা মশারি সরবরাহ করতে হবে না জেনে বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে জ্ঞানবাবুর পিতা বললেন, ছেলেদের রাত্তিরে না খাইয়ে ছাড়বেন না। সত্যেশ্বরবাবু মুখে খুশির ভাব গোপন করে বিনীত ভাবে চোখ মাটির দিকে করে অল্প একটু হেসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আমরা বুঝে নিলাম যে, রাত্রে আহারপর্বটা আতিথ্যের উপর দিয়ে চালিয়ে দেবার জন্যেই নলহাটি পর্যন্ত টিকিট কেনা। যা হোক, ভিতরে খবর দিয়ে জ্ঞানবাবুর বাবা বসলেন মাস্টারমশায় ও আমাদের নিয়ে। আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথা হল ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে, আমাদের কয়েকটা গানও তিনি শুনলেন। রাত্রে ভূরিভোজন সেরে নলহাটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসে কম্বল পেতে শুয়ে পড়া গেল। মনে আছে সেদিন ঘুমোবার আগে আমি গান করেছিলাম—

'আমার এ ঘরে আপনার করে

গৃহদীপখানি জ্বালো হে।'

আসন্ন শীতের ভোরের হাওয়ার আমেজে গা'টা শীত-শীত করে যখন ঘুম ভাঙল তখনো মাঝ-আকাশে দু-একটা তারা জ্বলছে— কেবল দিগন্তে একটু ফিকে আলোর রেখা ফুটেছে মাত্র। দু-একটা পাখি আসন্ন ভোরের খবর পেয়ে অন্যদের ডাকাডাকি শুরু করেছে। নলহাটি গঙ্গার উপরেই। হঠাৎ একটা ফেরি-স্টীমারের ভেঁপু বেজে উঠল। সেই ডাকে ঘুম ভেঙে উঠেই বঙ্কিমবাবু ক্ষিতিবাবুকে জাগিয়ে বললেন, 'ক্ষিতিদা, বাঁশিতে ডেকেছে কে।' ধড়ফড় করে সবাই উঠে পড়ে যে যার কম্বলটি ঝেড়ে আবার পোঁটলা বেঁধে ফেললাম। স্টেশনেই হাতমুখ ধুয়ে উপস্থিত হলাম ফেরি ঘাটে। গঙ্গার উপরটা তখনো কুয়াশায় ঢাকা। পৌঁছে দেখি স্টীমার প্রস্তুত। আমরাও প্রস্তুত— টিকিট কেটে চটপট উঠে পড়া গেল। অনেকবার ভেঁপু বাজিয়ে তবে স্টীমার ছাড়ল এবং আধঘণ্টার মধ্যেই ও পারে পৌঁছে দিল। শুনলাম জায়গাটির নাম সৈয়দাবাদ। জাহাজ-ঘাট থেকে সোজা রাস্তায় খানিকটা হেঁটে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতো বাড়ির সামনে গিয়ে পড়লাম। বাড়িটি বস্তুতই প্রাসাদ— দেউড়িতে এক সিপাই সঙ্গিন উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বঙ্কিমবাবু বললেন, 'আরে, এই তো মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর রাজপ্রাসাদ। খবর নেওয়া দরকার মহারাজা এখানেই আছেন কি না।' তখন সবে সূর্যের রক্তিমরাগ ফুটে উঠেছে। দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, মহারাজা প্রাসাদেই রয়েছেন, তবে বৈঠকখানায় নামতে কিছু বিলম্ব আছে, আটটার আগে দেখা হবে না। বঙ্কিমবাবু বললেন, 'মহারাজা যখন রয়েছেন তখন তো অপেক্ষা করাই কর্তব্য— নইলে অভদ্রতা হবে।' ক্ষিতিবাবু বললেন, 'রাজদর্শনে পুণ্য হয় এ কথা শাস্ত্রে লেখে।' সত্যেশ্বরবাবু মন্তব্য করলেন, 'এমন আড়াল দিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না— জানতে পারলে মহারাজা বেজার হবেন।' সাব্যস্ত হল, আমরা তবে অপেক্ষাই করব। আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, মাস্টারমশায়রা আমাদের প্রাতরাশটির সুবন্দোবস্ত করবার উদ্দেশ্যে গোড়াতেই মনঃস্থির করে এই পথে এসেছেন। অপেক্ষা করতে গিয়ে সময় যেন আর কাটে না। আটটা নাগাদ খবর এল, মহারাজা বৈঠকখানায় নেমে আমাদের তলব করেছেন। ক্ষিতিবাবুকে এগিয়ে দিয়ে বঙ্কিমবাবু ও সত্যেশ্বরবাবু আমাদের পিছনে রইলেন।

বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করেই আমরা জোড়হস্তে প্রণতি জানালাম। অতি প্রশস্ত ঘর— মূল্যবান কাচের ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে ঢাল-তলোয়ার টাঙানো, নানা আকার-প্রকারের। ছু-একটি আলমারিতে ছোটো বড়ো কামানের গোলা সযত্নে সাজানো রয়েছে। সাদা ফরাশের উপর মহারাজা বসেছেন। বেশ ফরসা চেহারা— গোঁফজোড়াতে একটু একটু পাক ধরেছে— পরনে সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি। প্রশান্ত মুখচ্ছবি, দেখলেই ভক্তি হয়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা?' ক্ষিতিবাবু বললেন তিনি এবং তাঁর ছুটি সহকর্মী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক। জনকতক আশ্রমবালককে নিয়ে ভ্রমণে বের হয়ে মহারাজের প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন— মহারাজা প্রাসাদেই রয়েছেন জেনে রাজদর্শন করে প্রণাম জানিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়েছে ছেলেদের। মহারাজা বললেন, 'রবিবাবু ভালো আছেন তো? আপনারা এসেছেন বলে ভারি খুশি হলাম। বস্থন আপনারা— বাবারা, তোমরা বোসো। এখানে চার পাশে ঐতিহাসিক স্থান বিস্তর রয়েছে।— আপনাদের যখন পেয়েছি তখন সহজে যেতে দিচ্ছি নে। আমার এখানে হেডকোয়ার্টার করে চার দিক ভ্রমণ করে দেখুন। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। ঐ-যে গোলাগুলো দেখছেন, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র চাষ করতে করতে পাওয়া গিয়েছিল। পলাশী নিকটেই— সেটা অবশ্য দেখবেন।' এইরকম করে আশে পাশে যা-যা দেখবার সবগুলিই উল্লেখ করলেন। আশ্রম সম্বন্ধে খুঁটিয়ে অনেক কথা জেনে নিলেন। পিছনে সত্যেশ্বরবাবু বঙ্কিমবাবুকে খুব নিচু গলায় বললেন, 'কেমন, বলেছিলাম না মহারাজা বেজার হবেন পাশ কাটিয়ে যদি চলে যেতাম।' ঠিক সেই সময়ে মহারাজের প্রশ্নের জবাবে ক্ষিতিবাবু বললেন যে, আশ্রমের ছেলেরা নিরামিষ আহারই করে থাকেন। শুনেই বঙ্কিমবাবু একটু নড়ে চড়ে উঠে সত্যেশ্বরবাবুর কানে কানে বললেন, 'দেখলে সত্যদা, ক্ষিতিদার কাণ্ডটা দেখলে। রাজভবনে নিরামিষ আহার! আরে ছ্যা!' পরে আড়ালে ক্ষিতিবাবুকে তিরস্কার করায় তিনি বঙ্কিমবাবুকে বললেন, 'আরে, আমি তো বলেছি আশ্রমে ছেলেরা নিরামিষ খান। তাঁরা যে রাজবাড়িতেও নিরামিষ খাবেন এমন কথা তো আমি বলি নি।' কিছুক্ষণ পরে মহারাজা একজন কর্মচারীকে কী যেন বলায় সে ব্যক্তি আমাদের ইঙ্গিত করতেই আমরা উঠে দাঁড়ালাম

এবং মহারাজকে আবার নমস্কার জানিয়ে কর্মচারীটির পিছু নিলাম। প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে গিয়ে গোটা ছুটিটারই ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় শিক্ষক ছাত্র সকলেরই খুব স্বস্তি বোধ হল।

কত হলঘর ও বারান্দা পেরিয়ে কত সিঁড়ি দিয়ে উঠে নেমে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম একেবারে নীচের তলায় একটা প্রকাণ্ড ঘরে, যার তিন দিকেই গঙ্গা প্রবাহিত। মনে হয় প্রাসাদের একটা হাতা যেন চলে গিয়েছে নদীবক্ষে। ঘরের তিন দিকে মেঝে থেকেই উঠেছে বড়ো বড়ো জানালা, যাতে করে ঘরের মেঝেতে বসেই দেখা যায়, যেন নদীপ্রবাহ চলেছে ঘরটি ঘিরে নিয়ে সাগরের দিকে। পরে শোনা গেল, ঐ ঘরটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গপথ বেয়ে রানীমার স্নানের জন্যে গঙ্গার জল চলে যায় একেবারে প্রাসাদের অন্তপুরে। আমরা আমাদের তল্পিতল্পা খুলে একখানা ধুতি ও গামছা বের করে নিয়ে সকলে মিলে গঙ্গায় স্নান করে সাঁতার দিয়ে অপূর্ব উল্লাস অনুভব করেছিলাম। স্নানান্তে নিজেদের কাপড় ও গেঞ্জি ধুয়ে নিঙড়িয়ে শুকোতে দিয়ে, আমরা যে যার কম্বলের আসন পেতে এখানে ওখানে নিরিবিলি বসে গেলাম আমাদের দৈনিক উপাসনায়। পরে শুনেছি, ঠিক সেই সময় রানীমা নাকি এসেছিলেন আশ্রমবালকদের দেখতে। 'এসে যখন দেখলেন ছেলেরা স্তিমিতনেত্রে ধ্যানাসনে স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন, সে দৃশ্য নাকি রানীমার বড়ো ভালো লেগেছিল, এবং ছেলেদের উদ্দেশে তাঁর মাতৃহৃদয়ের স্নেহ উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল। এর বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল যখন আমরা বেলা দশটা নাগাদ খেতে বসলাম। সে খাওয়াকে ভোজ বললেও যথোচিত হবে না। কত-না ভাজাভুজি, ঝাল ঝোল, চাটনি, অম্বল— ছত্রিশ ব্যাঞ্জনের কম হবে না। তার পর শুরু হল মিষ্টি— হরেক রকমের মিষ্টি— জিলেপি, পানতুয়া, আর রাজভোগ। কী বিশাল আকৃতি! পানতুয়ার জন্যে বহরমপুর অঞ্চলের যে নামডাক শোনা ছিল দেখলাম তা মিথ্যে নয়। নিরামিষ আহারের কথা শুনে বঙ্কিমবাবুর যে নৈরাশ্য হয়েছিল দু-চারটে মিষ্টি খেয়েই তার অবসান হয়ে মুখে হাসি ফুটে বের হল। তার উপর যখন এল বাদাম-কিশমিশ-দেওয়া পরমান্ন, তখন সবাইকে হার মানতে হল। কিরণচন্দ্র সেবার আমাদের সঙ্গে ছিলেন কি না মনে নেই। থাকলে পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। আর না থেকে থাকেন তো পরে আমাদের

গোয়ালপাড়া

ঘণ্টাতলা : শান্তিনিকেতন

কাছে ভোজের বর্ণনাটা শুনে আপশোষ-অনলে দগ্ধ হয়েছেন তাতেই বা সন্দেহ কী।

তার পর শুরু হল আমাদের ঐতিহাসিক-স্থান পরিদর্শন। কত যে দেখলাম জায়গা— যার খবর শুধু ইতিহাসের পাতায় পড়েছি। দেখলাম পলাশীর রণ-ক্ষেত্র। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়েছে ডাকবাংলা পর্যন্ত। সামনেই একটি স্মৃতিস্তম্ভ। ডাকবাংলোতে রয়েছে যুদ্ধের একটি মানচিত্র। সেটি ভালো করে দেখে নেমে পড়া গেল ধানক্ষেতের মধ্যে। এক জায়গায় একটি শান-বাঁধানো স্তম্ভে লেখা রয়েছে ইংরেজিতে: Right Flank of Mir Jaffer's Army। বেশ খানিকটা হেঁটে যাবার পর আর-একটি স্তম্ভ পাওয়া গেল যেটিতে লেখা আছে: Left Flank of Mir Jaffer's Army। বেশ বোঝা গেল মীরজাফরের সৈন্যদল কোন্ জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে ছিল, বিশ্বাসঘাতকতা করে পা বাড়ায় নি এক কদম। দূরে নিশানী পেলাম: French Guns। বোঝা গেল ফরাসী গোলন্দাজরা কোথায় কামান দাগছিল। এইরকম কত স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলা তথা ভারতের অপমান ও দুর্দশার মূক সাক্ষী রূপে। লর্ড কার্জনের উৎসাহে এই-সব চিহ্ন রক্ষা করা হয়েছে এবং এখনো লোপ পায় নি। ক্যাপটেন ক্লাইভের শিবির যে আমবাগানে ছিল তা তখন আর নেই— নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মোহনলাল কোথায় আহত হয়ে পড়ে ছিলেন এবং মারা গেলেন, মীরমদনের সমাধি, সমস্তই দেখলাম। আমাদের মানসচক্ষে এই-সব বীরপুরুষরা যেন জীবন্ত হয়ে উঠলেন আমাদের তরুণ মনের কল্পনায়। আমরা সকলেই যেন কেমন বিমনা হয়ে গিয়েছিলাম। একটা মর্মবেদনায় যেন মুষড়ে পড়লাম। কেবলই মনে পড়তে লাগল বাংলার ভাগ্য-হীন শেষ নবাবের করুণ কাহিনী। শত অপরাধ তাঁর ধুয়ে মুছে গিয়েছিল জীবনের অন্তিম আত্মোৎসর্গে।

দেখলাম হীরাঝিল, মতিঝিল, এক কালে যা নবাবের প্রমোদোদ্যান ছিল। সে শ্রী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল নবাবের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা যখন গিয়েছিলাম, দুটি ঝিলই কচুরিপানায় ছেয়ে গেছে। গেলাম সিরাজের সমাধি দেখতে। দেয়াল দিয়ে ঘেরা বেশ খানিকটা বাগান। মাঝে রয়েছে বড়ো একটি গম্বুজের তলায় শ্বেতপ্রস্তরের স্তূপ। উর্দু ফার্সি হরফে ও ভাষায় ক্ষিতিবাবু ছিলেন ওয়াকিফহাল। পড়ে তিনি বললেন, 'এটি নবাব আলিবর্দী

খাঁর সমাধি।' সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ালাম। এই কবরের সামনেই প্রশস্ত একটি শান-বাঁধানো চাতাল, সেই চাতালের উপর ইঁট সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি একটু উঁচু উঁচু অসংখ্য কবর— নবাব-পরিবারের কত-না বিস্মৃত অজানা নর-নারীর শেষ আবাসস্থান। কোনো কবরে কারও নাম লেখা দেখলাম না। তাঁদের পরিচয় কেউ আর জানবে না কোনোদিন। এই-সব নামগোত্রহীন হারানো কবরের মধ্যে একটির শিয়রে দেখা গেল একখানা সাদা প্রস্তরফলক। পড়ে ক্ষিতিবাবু বললেন, 'এইটিই নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমাধি।' স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বহুক্ষণ। বাংলাদেশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাবের এই শেষ স্মৃতি-চিহ্ন! এও রয়েছে লর্ড কার্জনের অনুকম্পায়। মনে হয় না আমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন সেদিন, সেই বাগানে সিরাজের এই পরিণাম দেখে যিনি বিচলিত হন নি। বাগানে ঢোকবার সময় দেখেছিলাম প্রবেশদ্বারে এবং দেয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে কিংবা কয়লায় লেখা কত উত্তেজনাময় বাণী বা কবিতা— 'জাগো সিরাজ! ওঠো সিরাজ!' স্পষ্ট বুঝলাম যে আমাদেরই মতো বহু তরুণের প্রাণ এই-সব লেখায় আপন আপন মুহ্যমান হৃদয়ের বেদনাকে ভাষা দিতে চেষ্টা করেছে। মনে পড়ল বিদেশী বণিকের সাম্রাজ্যবিস্তার, মনে পড়ল নীচাশয় বিশ্বাসঘাতকতা। মনে পড়ল সর্বস্বহারা একাকিনী লুৎফউন্নিসার নিত্য অভিসার এই বিজন বনে। আত্মীয়স্বজন কর্তৃক অনাদৃত, সেনাপতি ও সামন্তগণের দ্বারা পরিত্যক্ত, দুর্ভাগা স্বামীর সমাধিস্থলে প্রতি সন্ধ্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে একটি প্রদীপ জ্বেলে এই পতিব্রতা নারী তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করতেন তাঁর বেদনাতুর চিত্তের অপরিসীম প্রেম— 'ভুলি নি হে প্রিয়তম, তোমাকে ভুলি নি।' কী সকরুণ সে চিত্র, মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছিল। সেই নিত্য অভিসার কবে বন্ধ হয়ে গেছে— সে সন্ধ্যাদীপ আর তো কেউ জ্বালে না। আনতশিরে ক্ষুব্ধচিত্তে বের হয়ে এলাম সেই সমাধিক্ষেত্র থেকে।

তার পর আরো কত কী দেখলাম— জগৎশেঠের বাড়ি, মুর্শিদাবাদ-নবাবদের আধুনিক প্রাসাদ। আমরা শান্তিনিকেতনের ছাত্র বলে এবং নবাব-বাহাদুর তখন ছিলেন না বলে সে প্রাসাদে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছিলাম। মুর্শিদাবাদের যা দেখবার সব দেখে চললাম বহরমপুরে। প্রথমে দেখলাম সেখানকার রেশমীকুঠি। রেশম সম্বন্ধে মোটামুটি রকমের জ্ঞান আমাদের হয়েছিল জগদানন্দবাবুর কাছে গল্প শুনে আর সুধাকান্তের খাঁচায় পোষা

গুটিপোকা দেখে দেখে। এখানে কত রকম পোকার কত স্তরের চেহারাই দেখলাম। তার পর জানলাম কেমন করে গুটি ফাটিয়ে প্রজাপতিটি বেরিয়ে যায়। দেখে নিলাম কী করে রেশমের সুতো তৈরি হয়, কী করে সেই সুতো থেকে কাপড় চাদর বোনে। তার পর চলে গেলাম দূরে নিবিড় বেলবনের মধ্যস্থিত এক শিবমন্দির দেখতে। কিংবদন্তী শুনেছি, সেই শিবমন্দিরের একটি কুঠরিতে বসেই নাকি বাংলাদেশের সিপাহী-বিদ্রোহের প্রথম গুপ্ত মন্ত্রণা হয়েছিল। আমাদের কিশোর বয়সে স্বদেশী আন্দোলন খুব জোরে চলছিল, আমাদের মন নিঃশব্দে প্রস্তুত হচ্ছিল স্বদেশের দীক্ষা গ্রহণের জন্যে। সুতরাং এই বিজন শিবমন্দির দেখে ও তার গল্প শুনে আমাদের মন যে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী। এই মন্দিরে বিগ্রহের সামনে প্রণাম করতে গিয়ে, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই করবার সংকল্প করেছিলেন যে-সব সর্বত্যাগী স্বদেশভক্ত তাঁদের কথা স্মরণ করে মন আপ্লুত হয়েছিল সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায়। এই মন্দিরের বিগ্রহের নিয়মিত পূজা কেউ হয়তো আর করে না, সন্ধ্যারতির ধূপের ধোঁওয়া আর হয়তো ওঠে না, মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা হয়তো আর বাজে না— সে দিনও নেই, সে লোকসমাগমও নেই। সেই-সকল বিদ্রোহী প্রাণের ব্যাকুলতার মূক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেবল ভাঙা দেউলের দেবতা।

ছুনিয়ায় ভালো মন্দ কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। তিন-চার দিনের ছুটিটাকে আরও দিন-তিনেক টেনে সে-যাত্রা আমাদের ভ্রমণ শেষ হল। রাজদর্শন পেয়ে, রানীমার স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে, রাজভোগ খেয়ে, নানান ঐতিহাসিক স্থান চক্ষে দেখে কৃতার্থ হয়ে যখন ফিরে এলাম আশ্রমে, তখন জগদানন্দবাবুর মুখ খুব যে প্রসন্ন দেখলাম না তা বলাই বাহুল্য। সপ্তাহ-ভোর পড়ার কামাই হলে তিনি যে খুশি হয়ে উঠবেন, কী করে তা প্রত্যাশা করা যায়? কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এই পর্যটনে আমাদের দেহমনের শ্রান্তি দূর হয়ে নূতন স্ফূর্তি এসেছিল। নব উদ্যমে আমরা লেগে গেলাম আসন্ন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে।

সে আমলে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল বলেই মানতেন না। সুতরাং শান্তিনিকেতনের ছেলেদের ঘরে-পড়া ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসবার আগে কোনো সরকারী স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় পাস করতে হত। শান্তিনিকেতন থেকে ১৯১০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন গৌরদা ও দেবলদা। আমরা ছিলাম পরবর্তী দল। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর বরাবর জগদানন্দবাবু আমাদের নিয়ে গেলেন সিউড়ি সরকারী স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দেওয়াতে। সেখানে গিয়েও মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে ছাড়া পাবার জো নেই। পাটিগণিত, বীজগণিত আর জ্যামিতি-চর্চা সকালে আর বিকেলে নিয়মিত চলল পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত। সরকারী স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে ফেরবার কিছুদিন পরেই যখন খবর এল যে আমরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছি, মনে ভাবলাম, জগদানন্দবাবু খুশি হয়ে লাগামে একটু ঢিল দেবেন। আদবেই না— মাস্টারমশায় বরং বললেন, 'টেস্ট পরীক্ষা একটা পরীক্ষাই নয়। তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল পরীক্ষায় ফেল করলে সিউড়ি সরকারী স্কুলের তো নিন্দে হবে না, তাই দয়াপরবশ হয়ে সেখানকার হেডমাস্টার মশায় তোমাদের পাসের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এইবার হবে আসল পরীক্ষা। এখানে ট্যাঁ ফোঁ চলবে না।' কাজেই পড়াশুনা আবার তেড়ে চলল। অবশেষে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে আবার আমাদের সিউড়ি যেতে হল। সঙ্গে জগদানন্দবাবু তো গেলেনই—বোধ হয় নেপালবাবুও গিয়েছিলেন আমাদের ইংরেজিটাতে শেষ পোঁচ বুলিয়ে দিতে। না আছে খেলাধুলা, না আছে হাসিতামাশা গান। 'প্রাণ যায়' বলে হাঁফ ছাড়তে শুনলে জগদানন্দবাবু বলতেন, 'বাপে-

খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলেদের প্রাণ অত অমনিতেই যায় না।' প্রাণ গেলও না শেষ পর্যন্ত। যেদিন শেষ পরীক্ষা হল সেদিন বিকেলে সরকারী স্কুলের খেলার মাঠে আমাদের হুটোপাটি এখনো মনে পড়ে। কী মুক্তি! সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে, সেদিন জগদানন্দবাবুও কোনো বাধা-বাঁধন জারি করেন নি। আশ্রমে ফিরে নিজেদের তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে আমরা চললাম যে যার বাড়ি।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল, আমি পাস হয়ে গেছি। যতদূর স্মরণ আছে, আমাদের মধ্যে কেউই ফেল হন নি। তবে কে কোন্ বিভাগে পাস হয়েছিলেন মনে নেই। নিজে যে প্রথম শ্রেণীতে পাস হয়েছিলাম সেটা ভুলি নি। বিশ্বভারতী তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি; সুতরাং কলকাতার কোনো কলেজেই ঢুকতে হবে। কলকাতার কলেজে জায়গা পাওয়া তখনই কঠিন হতে শুরু হয়েছে। দরখাস্তের সঙ্গে মার্কশীট দিতে হত। মার্কশীট আনিয়ে দেখা গেল নম্বর মন্দ নয়। কম্পাল্সরি অঙ্কে নিরানব্বই এবং অ্যাডিশনাল অঙ্কে অষ্ট-আশী। স্কটিশ চার্চ কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হতে বেগ পেতে হয় নি। কলেজ খুলবার আগে আশ্রমে গেলাম গুরুদেব ও মাস্টারমশায়দের প্রণাম জানিয়ে আসতে। প্রথম জগদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হতে যেই-না ঢিপ্ করে প্রণাম করতে গেছি তিনি এক পা পিছিয়ে বললেন, 'বাস্ রে, আবার এয়েছে।' 'মশায়, আমি পাস হয়েছি। স্কটিশ চার্চে আই. এ. ক্লাসে ঢুকেছি।' এই বলে তাঁর মনোরঞ্জন করবার প্রয়াস পেতেই মনে হল, একটু চোরা হাসি যেন চোখের কোণে দেখা গেল। মুখে কিন্তু বললেন, 'ভাগ্যিস পাস হয়েছ, নইলে তো আবার আর-এক বছর ভোগাতে।' দেখলাম মাস্টারমশায়ের মনটা একটু ভিজে আসছে। বললাম, 'মশায়, প্রথম শ্রেণীতেই পাস নয়— দেখুন-না মার্কশীটটা।' মার্কশীট সামনে ধরতেই 'বাস্ রে, মারবে নাকি!' বলে খপ্ করে সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে সাগ্রহে পড়তে লাগলেন। কথা আর কিছু বললেন না। দেখলাম চোখদুটি জ্বল জ্বল করছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে— নম্বরটা দেখে মাস্টারমশায় যে খুশি হলেন এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কিছু হতে পারত না। শেষটায় বললেন, 'ঐ-সব গানটানের হাঙ্গামা না থাকলে আর পরীক্ষার আগে টৈ টৈ করে ঘুরে না বেড়ালে ঐ কটা নম্বরও যেত না। যাক, যা হয়েছে ঢের হয়েছে।'

গুরুদেব কখনো চান নি যে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছেলেরা কেবল পাস করবে ও অর্থই উপার্জন করবেন। তিনি এও প্রত্যাশা করেন নি যে আমরা প্রত্যেকেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করব। তিনি চেয়েছিলেন, আমরা যেখানেই যাই, যে কাজই করি, আমাদের কর্মে ও জীবনে শান্তিনিকেতনের আদর্শ প্রতিফলিত হবে ; দেখে লোকে যেন বলে, হ্যাঁ, শান্তিনিকেতনের ছেলে বটে। তাই আশ্রম ছেড়ে আসবার দিন গুরুদেবকে যখন প্রণাম করলাম তিনি বললেন, 'এখান থেকে যা পেলে তাকে জীবনে ফুটিয়ে তুলে ধন্য হোয়ো, এই আশীর্বাদ করি।' হরিবাবু বললেন, 'শিব শিব, এসো বাবা, মাঝে মাঝে যেন দেখা পাই।' শাস্ত্রীমশায় বললেন, 'কল্যাণমস্তু!' ক্ষিতিবাবু বললেন, 'আশ্রমজননী তোমার মঙ্গল করুন।' নেপালবাবু বললেন, 'এই তো পরীক্ষা আরম্ভ হল ; জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করো।' জগদানন্দবাবুকে প্রণাম করতে তিনি মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু অনেকখানি জানালেন কেবল মাথার উপর একবার হাত দিয়ে। গুরুজনদের সেইদিনের আশীর্বাদ রয়ে গেল আমার জীবনের পরম পাথেয় অক্ষয় সম্পদ হয়ে।

ত্র য়ো দ শ অ ধ্যা য় [ছাতিমতলা

শান্তিনিকেতনে যে-সকল মাস্টারমশায়ের কাছে পড়েছি তাঁরা ছিলেন যথার্থ গুরু। গুরুদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এঁরা শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেই-সব উৎসর্গীকৃত-প্রাণ গুরুদের কথা স্মরণ করলে মন ভরে ওঠে শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতাবোধে— তাঁদের দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বুঝতে পারি সত্যকার গুরু কাকে বলে। গুরুদেবের ভাষায় বলি— এই-সব শিক্ষক বুঝেছিলেন যে, তাঁরা গুরুর আসনে বসেছেন ; তাঁরা জেনেছিলেন যে, তাঁদের জীবনের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করতে হবে, তাঁদের স্নেহের দ্বারা ছাত্রদের কল্যাণসাধন করতে হবে। তাঁরা জীবিকার অনুরোধে কিছু বেতন নিলেও তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করে গেছেন। তাঁরা বিদ্যা বেচেন নি, বিদ্যা দান করেছেন অকাতরে। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দান করতে কৃপণতা করেন নি বলেই আমরাও সম্পূর্ণভাবে সে মহাদান গ্রহণ করতে পেরেছি। মাস্টারমশায়রা জ্ঞানের চর্চায় নিত্যনিযুক্ত ছিলেন বলেই আমরা ছাত্রেরা বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি। বাইরের যে-কোনো বিদ্যায়তনে এঁরা প্রত্যেকেই অধিক আর্থিক সমৃদ্ধি এবং প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন। এঁরা কিন্তু সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনের সেবার গৌরবে, আর্থিক অনটন অগ্রাহ্য করেও। আমাদের ভাগ্যক্রমে ক্ষিতিবাবু এখনো রয়েছেন আমাদের মধ্যে, একে

একে আর সকলেই প্রায় চলে গেছেন অন্য লোকে। আমার জীবনের এই সায়াহ্নবেলায়, যে-সকল গুরু চলে গেছেন এবং যাঁরা রয়েছেন আজও তাঁদের সকলের উদ্দেশেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

আমাদের আশ্রমের দৈনন্দিন কর্মসূচীর কথা যা বলেছি তাতে করেই সুস্পষ্ট বোঝা যাবে যে, সেকালের শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রা-প্রণালী সরল সুন্দর ও সরস ছিল। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল। বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র স্বরূপ লক্ষ্য করেছি সেই বালক বয়সেও। নিদাঘতাপদগ্ধ ধরিত্রীর বুকে দেখেছি বৈশাখের রুদ্র মূর্তি। উত্তপ্ত হালকা বাতাস দুপুরবেলায় কেঁপে কেঁপে ছুটে যেত উন্মুক্ত প্রান্তর ও খোয়াইয়ের উপর দিয়ে। দিনশেষে ঈশান কোণে কালবৈশাখীর পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ হঠাৎ দেখা দিয়েই যখন মুষলধারায় এসে পড়ত আচমকা ঝাপটে চির-পিপাসিত ধরিত্রীর বুকে, তখন বোঝা যেত 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে' কী প্রত্যক্ষ। স্পষ্ট দেখেছি দূরে সুরুলের 'শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে' তার পর বনরাজিকে ঝাপসা করে বৃষ্টি চলে আসত, যেন হেঁটে হেঁটে ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে ভিজে মাটির গন্ধ বহন করে। বর্ষার দিনে দেখেছি 'জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের 'পরে', তার পর সে জল গড়িয়ে পড়ত খোয়াইয়ের মধ্যে, তার পরে বহু ধারা এক হয়ে মিশে ছোটো নদীর মতো হয়ে গিয়ে পড়ত কোপাই নদীতে। অচিরে সে নদীতে বান এসে পড়ত কলধ্বনি করতে করতে এবং কান পেতে শুনেছি 'উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে।' বর্ষার জোলো হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসা কেয়াফুলের গন্ধে মাতিয়ে দিত আমাদের তরুণ হৃদয়গুলিকে। 'ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে, বাদলবাতাস মাতে মালতীর গন্ধে' এ কেবল গুরুদেবের কাব্যেই যে পড়েছি তা নয়— প্রত্যক্ষ করেছি শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাস-কালে। দেখেছি, পুঞ্জীভূত আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘের বুক-চেরা বিদ্যুতের রুদ্রমূর্তি এবং পরক্ষণেই শুনেছি 'বাদল-মেঘে মাদল বাজে, গুরু গুরু গুরু গুরু গগন-মাঝে'। বিদ্যুৎ ও অশনিপাত উভয়ে মিলে যুগপৎ ভয় বিস্ময় সৃজন করেছে আমাদের শিশুচিত্তে। শ্রাবণের ঘনঘটায় কখন অজানিতে 'নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে'— চোখ জুড়িয়ে গেছে বাইরের

দিকে চেয়ে। তার পর 'গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায় তাঁর আলসে-অবলুণ্ঠন সারা' করে প্রকৃতিদেবী যখন মুখের অবগুণ্ঠন খুলে জেগে উঠেছেন, তখনো তাঁর 'নয়নপাতে সজল মেঘের কাজল বুলানো' একেবারে মুছে যায় নি। দেখতে দেখতে শরতের 'শিশিরসিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে, মৃদু মর্মর-গানে তব মর্মের বাণী' বলা শুরু হয়ে যেত— শরৎকালের 'ধৌতশ্যামল আলো-ঝলমল' ধানক্ষেত আর সুনীল আকাশ শান্তিনিকেতনে যেমনটি দেখেছি তেমনটি দেখি নি আর-কোনো দেশে। ছুটির দিনে 'রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা' দেখেছি ধানের ক্ষেতে সারাদিনমান। ভেবে অন্ত পাই নি মাথার উপরে 'নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা'— সেই-সব খণ্ড মেঘগুলির ছায়া পড়ত তালপুকুরের স্বচ্ছ সুনীল জলে। বিকেলবেলায় ভাসিয়ে দিতাম আমাদের কাগজের নৌকাগুলি আর মনে মনে ভাবতাম, 'ঐ মেঘ আর তরণী আমার কে যাবে কাহার আগে।' তালপুকুরে 'চিত্রা' নৌকার 'পরে দাঁড় ধরে বসলে তবে-না গান জমত 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান, দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্।' 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া' যে কী তা পলকে প্রত্যক্ষ করা যেত শান্তিনিকেতনের শরৎকালের মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালে। তার পর বসন্তের বাহার দেখেছি শান্তিনিকেতনের পুষ্পতরুলতায়— 'থরথর-কম্পিত মর্মরমুখরিত নবপল্লবপুলকিত' বসন্তকে আমরা আহ্বান করেছি উচ্ছ্বসিত গলায় গান গেয়ে গেয়ে ; অচিরে দেখা যেত পলাশফুলের টকটকে লাল রঙে 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে, ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে, আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।' কত বিহঙ্গের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠত আমাদের আশ্রমটি।

এইরকম পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমরা ছিলাম আনন্দে বিহ্বল, অকারণে চঞ্চল ; গুরুদেবের ভাষায়— আমাদের হৃদয় তখন নবীন ছিল, কৌতূহল ছিল সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি ছিল সতেজ। সেই সময় মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলায় আমরা খেলা করেছি এবং ভূমার আলিঙ্গন থেকে আমরা বঞ্চিত হই নি। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় আমাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলি দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করেছে এবং

সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন আমাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করে দিয়েছে। তরুলতা-পুষ্প-পল্লবিত নাট্যঘরে ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রসবিচিত্র গীতনৃত্যাভিনয় আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। আমরা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল মেঘ নিয়ে গুরু গুরু গর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপর আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনিয়ে তুলেছে ; শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র সফলতার আদিগন্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখে আমরা ধন্য হয়েছি। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে, মুক্ত আকাশের তলায়, খোলা মাঠের খেলায়, অধ্যয়নে, অভিনয়ে, গানে, মাস্টারমশায়দের ভালোবাসায় এবং গুরুদেবের স্নেহদৃষ্টির আশ্রয়ে বেড়ে উঠবার সুযোগ আমরা পেয়েছি, গুরুদেবের নিত্য-সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছি। আশ্রমের আকাশ এবং বাতাস, আলো এবং জল আমাদের শরীরকে ব্রহ্মচর্যপালনে স্বাস্থ্যবান, মনকে অনুকূল এবং হৃদয়কে প্রশস্ত করেছে নিভৃতে, নিঃশব্দে এবং আমাদের অজানিতে। সেই ভিত্তির আশ্রয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের জীবন। আশ্রমজননী আমাদের জীবনপাত্র ভরে দিয়েছেন অমৃতসুধায়।

সেই আশ্রম যখন ছেড়ে এলাম তখন হৃদয়তন্ত্রীগুলিতে খুবই টান পড়েছিল, মনের মধ্যে গভীর বেদনা অনুভব করেছিলাম। আশ্রমের আকাশ বাতাস আলো, পরিচিত তরুলতা যা আমাদের সঙ্গে বেড়ে উঠছিল, তারা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে পিছু ডেকেছিল। নতমস্তকে বেদনাতুর হৃদয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়। পরে জেনেছি, আশ্রমজননী তো আমাকে ছাড়লেন না— এখনো নিত্য টানেন তাঁর স্নেহময় ক্রোড়ে। শুষ্ক জীবন ভরে নিতে ফিরে ফিরে যাই আশ্রমের নিত্য-উৎসারিত আনন্দের ঝর্নাতলায়, হৃদয়পাত্রটি আবার ভরে নিই আশ্রমজননীর বিগলিত করুণার কল্যাণে, পুণ্যে ও পুলকে—

‘আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে।’

—

শান্তিনিকেতন

আমাদের শান্তিনিকেতন।
সে যে সব হতে আপন।

তার আকাশভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন।
মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগমাখা সকাল সন্ধেবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন।
আমাদের শান্তিনিকেতন।

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে একমন।
আমাদের শান্তিনিকেতন॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ পৌষ
১৩২৩